গালিনা দেমিকিনা

বনের গান

গালিনা দেমিকিনা

বনের গান

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

সূচি

মুখবন্ধ

প্রিয় বন্ধুরা,

রূপকথার সঙ্গে কবে তোমাদের পরিচয় হয়েছে? আমার জীবনে রূপকথা প্রথম আসে যখন আমার পূর্ণ হয় পাঁচ বছর।

ব্যাপারটি ঘটে এইভাবে।

আমার খুব পছন্দ হয়েছিল শাদা লোমওয়ালা একটি কুকুর। ওটা বসে ছিল খেলনার দোকানের কাচের শো-কেসে। তার পাশে ছিল চোখ-বোজা পুতুল, হলদে ও বাদামী রঙের বড় বড় ভালুক, বিভিন্ন ধরনের মোটরগাড়ি। কিন্তু আমি মা'র সঙ্গে দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেবল গোলাপী জিভওয়ালা শাদা কুকুরটিকেই দেখতাম। সময় সময় আমার মনে হত যে কুকুরটি হাসছে ও রোদে চোখ কুঁচকাচ্ছে।

মনে মনে কুকুরটির নাম রাখলাম — লোমশ। ওটাকে পেলে কী ভালই হত!

কিন্তু শাদা লোমশ কুকুরটি নিজের জায়গায়ই থাকল — খেলনার দোকানে কাচের শো-কেসে। আর বড়োদের কোনকিছু কিনে দিতে বলার রেওয়াজ আমাদের বাড়িতে ছিল না।

আমার জন্মদিন এল: আমার ঠিক পাঁচ বছর পূর্ণ হল। আমার ঘুম ভেঙ্গে যায় কোন এক খস্‌খস্‌ শব্দে। তখনও বাইরে ভীষণ অন্ধকার। চোখ খুলতেই দেখি: খাটের কাছে চেয়ারের উপর গোলাপী জিভটি একটু বের ক'রে বসে আছে!.. হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই ধরেছ — কে। বসে আছে আমার লোমশ। বসে বসে হাসছে। এরূপ হাসি হাসতে পারে কেবল খুব ভাল ও বুদ্ধিমান কুকুরেরা।

কিন্তু পরে কী ঘটল তা তোমরা কিছুতেই ধরতে পারবে না।

— লোমশ! — বলেই জড়িয়ে ধরলাম খেলনাটিকে। হঠাৎ ওটা সামান্য ডেকে উঠে চেটে দিল আমার মুখ আর গলা। ওটা ছিল জ্যান্ত কুকুর! আমি তা কল্পনাও করতে পারি নি।

আমার গায়ে ছিল শোবার জামা। সেই অবস্থাতেই খালি পায়ে আমি মা'র কাছে ছুটলাম।

— মা, মা, আমার লোমশ আছে!

আমার আনন্দে মা-ও আনন্দিত, কিন্তু সুন্দর এই কুকুরটি কোত্থেকে এল কিছুতেই বলতে পারলেন না।

এটা কি চমৎকার ঘটনা নয়? এটা কি সুন্দর রূপকথার সঙ্গে সাক্ষাৎ নয়?

আর আমি নিজে যখন খুব ভ্রমণ করতে লাগলাম, তখন লক্ষ্য করলাম: আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চল অপূর্ব এক রূপকথার রাজ্য। উত্তরের সৌন্দর্য দু'এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। শীতে সেখানে কী শাদা তুষার, আর গ্রীষ্ম কী সোহাগী! ওখানে অনেকখন ধরে চলে সূর্যাস্ত, — সূর্য বহু আগেই ডুবে গেছে, ঘড়ির কাঁটা দেখাচ্ছে রাত দুপুর! কিন্তু কিছুতেই অন্ধকার হয় না, এবং পশ্চিম দিগন্তে প্রায় একেবারে প্রভাত অবধি টিকে থাকে গোলাপী এক রেখা।

আর আকাশের পূর্ব দিগন্তে তখন ফুটে ওঠে অন্য একটি রেখা, এবং ওটাও হতে থাকে গোলাপী। এর একটি হল সূর্যাস্তের চিহ্ন, অপরটি — সূর্যোদয়ের।

ঈষৎ অন্ধকারে — গ্রীষ্মের সময় উত্তরে রাত হয় না! — লোকেরা ভাল ও মন্দ দৈত্যদের গল্প বলে। অদেখা জন্তুজানোয়ার আর কথা-বলা মাছের কত মজার মজার কাহিনী তাদের জানা আছে। এবং তাতে বিস্ময়ের কী আছে — চারিদিকে বন আর বন, মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হ্রদ-সরোবর আর নদীনালা, আর দূরে — বিশাল মেরু মহাসাগর! গল্পগুলি সত্যি কী চমৎকার, যেন গোধূলির রঙীন আলোয় রাঙানো!

উত্তরেরই একটি গ্রামে আমার দেখা হয় আলিওনা নামে ছোট্ট এক মেয়ের সঙ্গে। তার কথা আমি লিখেছি 'বকপুর গ্রাম, বাড়ি নং ১' গল্পটিতে। গ্রামের নামটি শুনে আলিওনা ও আমি খুব অবাক হই। বক হচ্ছে — বড় শাদা এক পাখি যা মানুষের বাসস্থানের কাছাকাছিই বাসা তৈরি করতে ভালবাসে, কিন্তু বকপুর — গ্রামটির এরূপ নামের কারণ কী?!

পরে অবশ্য আলিওনা আর আমি সবকিছুই জানলাম: যেখানে গড়ে উঠেছে 'বকপুর' গ্রাম ওখানে সর্বপ্রথমে এসে বাসা বাঁধে শাদা এক বক। এই কথাটি আমাদের বললেন আলিওনার দিদিমা। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম:

— এটা কি রূপকথা?

আর তিনি জবাব দেন:

— বুড়ো লোকেরা বলে।

আলিওনা ভাবতে লাগল, দেখতে লাগল চারিদিকে এবং হঠাৎ তার মনে হল — এই রূপকথাটি কি তার দিদিমাকে নিয়ে নয়? তাঁকেই হয়তো মন্দ যাদুকর অনেক অনেক দিন আগে যাদু করে শাদা বক বানিয়ে দেয়... আর যে বুড়ো লোকটি বকপুরের কাছে বাস করে সেই হয়তো হচ্ছে ওই ভাল মানুষ, যে দিদিমাকে যাদুমুক্ত করে? তবে ব্যাপারটি ঘটে অনেক অনেক দিন আগে, যখন তাঁরা ছিলেন জোয়ান...

তোমরা এখন বুঝতেই পারছ যে রূপকথার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব শুরু হয় বহুকাল আগে। যখন আমি ভ্রমণে বেরুই, যাই অচেনা জায়গায় — যেখানে হয়তো আমার কোন বিপদও ঘটতে পারে, — সঙ্গে নিই রূপকথা। রূপকথা — আমার পথের সাথী, রূপকথা — আমার ছোট্ট জ্যান্ত এক কম্পাস।

এই 'কম্পাস' শব্দটি লিখতেই আমার মনে পড়ছে দূর সমুদ্রযাত্রার গল্প। সাগর-মহাসাগরে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে একটি ছেলে। তার কথাই বলা হয়েছে অপর এক গল্পে। গল্পটির নাম — 'আমার কাপ্তেন'। সে হচ্ছে ভাল ও সাহসী মানুষ। তাছাড়া তার বন্ধুত্বও সুন্দর আর খাঁটি।

রূপকথার ছোট কম্পাস নিয়ে ভ্রমণের সময় একবার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল — আমার দেখা হল চুচা নামের ছোট্ট একটি জীবের সঙ্গে। সে ছিল অদ্ভুত এক জীব যা সচরাচর চোখে পড়ে না। চুচা আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত করে দিল বনের অসংখ্য রহস্য। তার জন্ম হয়

বনে, তবে ঠিক কোন বনে তা বলা শক্ত কেননা তার বিষয়ে আমি লিখতে আরম্ভ করি আমাদের দেশের পশ্চিমে সংরক্ষিত এক বনাঞ্চলে।

তোমরা জান, সংরক্ষিত বনাঞ্চল কী? সংরক্ষিত বনাঞ্চল হচ্ছে এমন বন যা কাটা (কেবল অসুস্থ গাছপালা ছাড়া) যায় না, এরূপ বনে ফাঁদ পাতা এবং পশুপাখি বধ করা নিষিদ্ধ।

আমি যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের উল্লেখ করছিলাম তার নাম — বেলোভেজস্কায়া পুশ্চা। ওখানে আছে কী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওক গাছ যা পাঁচ-ছ'জন লোকও হাত একত্র জুড়ে আঁকড়ে ধরতে পারবে না। আর বার্চগাছগুলিও ভীষণ উঁচু উঁচু — চূড়ার দিকে তাকালে মনে হয় যেন একেবারে আকাশ ছুঁয়ে ফেলবে।

ওই বনে থাকে শিংওয়ালা সরু-পা উস্কোখুস্কো লোমশ ইউরোপীয় বাইসনেরা। পৃথিবীতে এগুলির সংখ্যা এখন খুব কম। তবে পুশ্চাতে বেশ কয়েকটি আছে। থাকে তারা খোঁয়াড়ে কিংবা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে বনে, ঘাস খায়, খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে।

একদিন আমি গাছপালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য বসলাম পুরনো বার্চের একটি গুঁড়িতে। কাছেই বিশাল এক বৃক্ষ, তাতে কিচিরমিচির করছে পাখিরা... আমার একটু তন্দ্রার ভাব হল। আর যখন চোখ খুললাম, দেখতে পেলাম গাছের ডালে বসে আছে অদ্ভুত এক জীব এবং পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম যে আমার কাছে আবার — এবং এ নিয়ে কতবার যে হল! — এসেছে রূপকথা। এই রূপকথাটির নাম হবে 'বনের গান'।

'বনের গানে' আছে বনের প্রতি আমার মনের টান (থাকি আমি শহরে, মস্কোর কেন্দ্রস্থলে), বনকে, তার পশুপাখি, গাছপালা আর লতাপাতাকে বুঝতে না পারার জন্য দুঃখ। তাদের পাশে বাস করেও আমরা মানুষেরা তাদের প্রায়ই বুঝি না।

এখানে আমি বলতে চেয়েছি বন্ধুত্বের কথা, তার জটিল নিয়মের কথা, স্নেহমমতার কথা যা অনেক সময় ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সত্যিই তো, কেন আমার শান্ত সোহাগী চুচা হঠাৎ দোস্তি পাতাল নেকড়েছানার সঙ্গে যে এই অল্প বয়সেই বনের অন্যান্য পশুপাখিদের অপমান করতে পারে? আর হয়তো বা সে তা করতে ভালওবাসে? কেন আমাদের অনেক সময় পছন্দ হয় সেই লোক যার বিষয়ে আমরা জানি: ও সেরা লোক নয়, ওর চেয়েও অনেক ভাল লোক রয়েছে? আর যারা অপেক্ষাকৃত ভাল তাদের কেন যেন আমরা পছন্দই করি না?

আমি তোমাদের দিতে চাই আমাদের উত্তরাঞ্চলের বনের সৌরভ — রজনের গন্ধ, শুকনো ডালপালার গন্ধ, গাছপালা, ঘাস, লতাপাতার আর ফুলের গন্ধ। আমি তোমাদের শোনাতে চাই পাখির কলকাকলি আর জন্তু-জানোয়ারের ডাক। আমি তোমাদের দিতে চাই মাঠের সৌরভ — যেখানে অনুত্তপ্ত সূর্যালোকে পাকছে বসন্তের ফসল।

আমি চাই, তোমরা ভালবাসতে শেখো আমাদের উত্তরের মাটিকে, যেখানে গোধূলি অপেক্ষা করে ঊষার। তোমরা এই বইখানি পড়ে যদি সামান্যও উপকৃত হও, আমি খুব খুশি হব।

লেখিকা

বনের গান
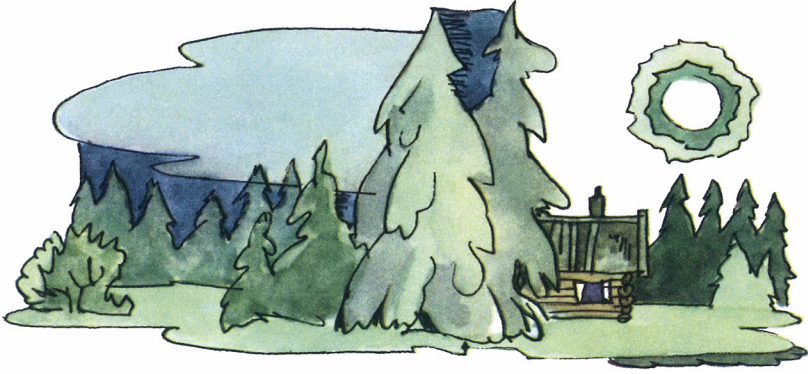
প্রথম অধ্যায়

চুচা

(চুচার দ্বিতীয় জীবন)

— এবার আমরা সংরক্ষিত বনে ঢুকছি! — চেঁচিয়ে উঠল ভাই।

তার কাঁধ দু'টি শক্ত করে ধরে আমি বসে আছি, মাথাটি লুকিয়ে রেখেছি যাতে হাওয়া না লাগে। আমাদের মোটর সাইকেল ছুটে চলেছে ঘেসো বুনো পথ ধরে। পথের দু' ধারে সারি সারি গাছ আর ঝোপঝাড়:

অ্যাশ ফার পাইন,
ফার বার্চ ওক,
আখরোটের ঝোপঝাড়...

— এগেই, ওই দেখ্! — আবার চেঁচিয়ে বলল ভাই।

— কী?

— আমার 'চৌকি'! — বেপরোয়ার মত হঠাৎ ও ব্র্যাক কষল মোটর সাইকেলের। নেমেই সুটকেসটি হাতে নিল।

— নামতে আজ্ঞা হোক ভগিনী মহোদয়া!

আমি সর্বাদিকে তাকালাম। বনের ঠিক মাঝখানে কাঠের ছোট একটি বাড়ি। চারিপাশে — বেড়া দিয়ে ঘেরা আলুখেত।

— বেড়া দিয়েছিস কিসের ভয়ে?

— কিসের ভয়ে মানে? বুনো শুয়োর-টুয়োর যাতে ঝামেলা না করে।

বাড়িটি নতুন, কাঠের গন্ধ এখনও তাজা। ভেতরে টেবিলে বই, সোফা।

ভাই উনুন ধরাতে লাগল। আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। বনে থেকে থেকে তিন বছরে বেশ জোয়ান হয়ে গেছে। মেজাজ রুক্ষ। গম্ভীর জোয়ান মানুষ — আমার বড় ভাই।

— এখানে মন খারাপ করে না তোর? শহরের জন্য মন টানে না?

— কী যে বলিস? মন খারাপের ফুরসতই নেই। নিজের এলাকার সব গাছের চেহারা আমার জানা। জন্তু-জানোয়ারদেরও চিনি।

— জন্তু-জানোয়ারও আছে বুঝি?

— আর তুই কী ভেবেছিস! এটা যে তোর মস্কো নয়।

— কী কী জন্তু আছে?

— হরেক রকমের। সবুর কর, নিজেই দেখতে পাবি।

আমি বাড়ি থেকে বেরলাম। বন গরম, শুকনো, রজনের গন্ধে ভরপুর। রাস্তা। তা থেকে চলে গেছে আরও একটি সরু পথ। গাছের ডালে ডালে লেগে আছে শুকনো ঘাস — এখান দিয়ে ট্রাকে করে লোকে নিশ্চয়ই খড়কুটা নিয়ে গেছে। গাছে — পাখির গোল গোল বাসা, কোটর। বনের ঠিক মাঝখানে গাছের পুরনো গুঁড়ির ওপর — কাঠের বাক্সে রয়েছে পশুপাখির জন্য খাবার। এর মানে? এখানে আসে জানোয়ারেরা, যা-ই তাদের দেওয়া হয় তাই তারা খায় পোষা জন্তুর মত? তার মানে, সত্যিই মানুষ বনকে সাহায্য করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখে ও ভালবাসে।

আর বন?

লাল বিলবেরি ঝোপ ঘেঁষে, জড়শুদ্ধ উপড়ে পড়া ফারগাছের পাশ ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে পায়ে চলা সরু পথ। দু'দিকে কিছুদূর গিয়েই তা শেষ। পথটি বিলীন হয়ে গেছে ঘন বনে — ওখানে এখনও মানুষের বাস নেই।

বিজিবিজি গাছ, তাদের মাথাগুলো গেছে মিলে। নিচে অন্ধকার। চোখে পড়ছে শুধু বনের ভেতরের ফাঁক, সবুজ আলোকোজ্জ্বল জায়গাগুলো। এ যেন বনের হাসি। যেন বনের উপহার।

'উ-ই! উ-ই!' — শোনা গেল ওপর থেকে।

'কে-কে-কে।' পাশেরই ঝোপ থেকে এল জবাব।

'তক-তক-চি। তক-তক-চি!'

গাছে গাছে নড়ে উঠল ডালপালা, শোনা গেল ডানা-ঝাপটানি, মাটিতে পড়তে লাগল মোচা আর শুকনো ডাল।

সে কী?

কোন্ পাখি?

কী জন্তু?

'শা-শা-আ-আ।' — ভাসে বনের ওপর।

'কে-কে-কে।' — শোনা যায় নিচে।

'স্কা-স্কা-স্কা!' — জবাব আসে ঘাস থেকে। আর এই সমস্তকিছু মিলে যাচ্ছে একটি গানে। আরও একটু হলেই আমি বুঝতে পারব এ গান। কিন্তু কই, পারলাম না তো। ফসকে যাচ্ছে।

— তুই বনের গান শুনেছিস? — বাড়ি ফিরে জিজ্ঞেস করি ভাইকে।

— কী?

— মানে... গাছের গান।

— কোন্ গাছের?

— সব রকমের...

— ঠিক আছে, তুই এবার জিরিয়ে নে। আর আমি দেখে আসি — সাপ-খাইয়েরা এল কিনা।

— ওরা আবার কারা?

— এক রকমের পাখি। সাপ ধরে খায়। খুব উপকার করে।

বিলবেরির ঝোপ, পড়ে-থাকা ফারগাছ, বনে হারিয়ে যাওয়া পায়ে-চলা সরু পথ। গাছের নিচে অন্ধকার। আমি চিনি গাছগুলিকে, গাছেরাও চেনে আমাকে। তবে বনের এই ছোট ফাঁকা জায়গাটি অবধি আগে কখনও আমি আসি নি।

এক পাশে — বিশাল পাইন গাছ, আঁশে ঢাকা শিকড়। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে শিকড় দু'টি, যেন দু'ই অজগর। আর তাদের মধ্যিখানে ঘাসের ওপর — কালো-সবুজ ছায়া, ঠিক বিছানার মত। শুয়ে দাও এক ঘুম। আমার ঢুলুনিও এল।

'শা-শা-আ-আ!' — ভাসে বনের ওপর।

'উ-ই-কে-কে!' — শোনা যায় ঝোপেঝাড়ে।

'স্কা-স্কা-স্কা!' — একেবারে মুখের কাছে, ঘাস থেকে।

এবং আবার সমস্তকিছু মিশে যাচ্ছে গানে, বনের অনন্ত গানে, আর সে গান যে বুঝব তা আমার কপালে নেই।

হঠাৎ ঘুম ভাঙল। আশঙ্কা হল: সবাই তাকিয়ে আছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এবং সত্যিই তা-ই। পাইনের ডালে মাথা উপুড় করে ঝুলছে ধূসর এক জীব, — দেখতে ছোট্ট কাঠবেড়ালীর মত, লেজে ফুঁয়োফুঁয়ো লোম। বড় কানওয়ালা ধূসর মুখে চোখদু'টি যেন দুই পুঁতি। আমি নড়লাম না, শুধু তাকিয়ে রইলাম। জীবটি আঁচড় দিল গাছের চালে, ছোট গোলাপী আঙুল দিয়ে আঁকড়ে ধরে নামল একটু নিচে। আটকে থাকতে পারল না — ধপ্ করে পড়ল গিয়ে ঘাসে, একেবারে আমার কানের কাছে।

ভড়কে গেল, চড়ুইয়ের মত ডাকল — চিঁড়িক — চিচু! — এবং দূরে সরে গেল, ঘাসে হল খস্‌খস্ শব্দ।

এবারও আমি নড়লাম না। খানিক পরেই আমার হাতটি ছুঁল তার গরম শুকনো নাক। নখগুলি হাতের তালুতে কাটল আঁচড়। আমি মাথা তুললাম — একটু দেখব বলে। আর ও — দে ছুট, একেবারে গাছে। ওই যা, ধরে ফেললেই ভাল হত। এবার কিছুতেই নামবে না।

জীবটি শুয়ে রইল নিচের ভাঙা শুকনো এক ডালে — ফুঁয়োফুঁয়ো লোমওয়ালা লেজখানা ঝুলছে, একখানা গোলাপী পাও আছে লটকে। আর কৌতূহলী পুঁতি-চোখে দেখছে তো দেখছেই।

— এই বেটা, চুচার বাচ্চা!

— চিচু — চিচু, — ডাকল সে।

— আয় তো এখানে! — হাত বাড়াই আমি। — ভয় নেই, আয়।

আবার সে নিচের দিকে মুখ করল। কান খাড়া। ডাক শুনে নামতে লাগল। ছাল বেয়ে নামছে, কাছে, আরও কাছে... শেষে — আমার একদম পাশে। গোলাপী ঠেং দিয়ে ছুঁল হাত। পেছনে সরে গেল। আবার এল সামনে। শেষ পর্যন্ত ঢুকল নিষিদ্ধ এলাকায়। ব্যস, বাছাধন এবার আর যায় কোথায়। অন্য হাত দিয়ে আমি তাকে ঢেকে ফেলি — লেজের ডগাটাই শুধু বাইরে। চেঁচাল, নড়ল-চড়ল, আঁচড় মারল। তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

বাড়িতে তার জন্য ছিল পাখির খাঁচা।

— দারুণ তো! — খুশি হল ভাই। — এমন জীব বাপের জন্মেও দেখি নি। কালই প্রাণিবিদকে ডেকে আনব। কে জানে — যদি কোন নয়া জীবটির হয়?

কিন্তু প্রাণিবিদেরও জানা ছিল না। অবাক হল:

— দেখতে তো ডরমাউস*-এর মত, — এরকম এক জীবও আছে। তবে আমাদের এখানে এসব নেই। আর তাছাড়া — ঠেংগুলি দেখো, বানরের হাতের মত... আমি বরং এটাকে যাদুঘরে নিয়ে যাব।

— না, না!

— আপাতত তোমাদের কাছে থাকুক। দু'এক দিনের মধ্যেই আমাদের বড় প্রাণিবিদ আসবে...

— চিচু — চিচু! — শোনা গেল খাঁচা থেকে।

— এই চিচুর বাচ্চা চুচা, বল্ কে তুই?

বাড়িতে কোন জীব এলেই — হোক তা মামুলি বেড়ালছানা — তাকে নিয়ে শুরু হয় রাজ্যির ঝামেলা। আগে হয়তো টেবিলে বসে নিশ্চিন্তে কাজ করতে, আর এখন খেয়াল রাখতে

---

* ডরমাউস (Dormouse) — এক প্রকার জীব, দেখতে কাঠবেড়ালীর মত, শীত কাটায় ঘুমিয়ে। — সম্পাঃ

হবে — জীবটির খাঁচায় জলদুধ আছে কিনা। যখনই সে হাঁটুর ওপর লাফিয়ে উঠবে, গায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া চাই। ঘুমিয়ে পড়লে নড়তে পারবে না।

আগে না হয় দরজাটি সামান্য ভেজিয়ে দিয়েই চলে যেতে পারতে, আর এখন — ফিরে গিয়ে দেখে এস জানলাটি বন্ধ করেছ কিনা, নয়তো লাফ মেরে বেরিয়ে যাবে। টেবিলের ওপর থেকে কাপপ্লেট সরালে কিনা — ভেঙ্গে ফেলবে।

আর চুচা, অদ্ভুত এই জীবটি, আমার সময়ের সবটুকুই নিয়ে নিল। প্রথমত, সে খেল না, কিছুই খেল না। দু'দিন কেটে গেছে। সামনের পা দু'টি দিয়ে মাথা আঁকড়ে ধরে পেছনের পায়ে বসে আছে খাঁচার কোণায়। চেহারায় হতাশার ছাপ: হায় হায়, কী করলাম? কী আহাম্মক? কী গাধা!

— চল, ছেড়ে দিই, — বললাম আমি ভাইকে।

— পাগল না মাথা খারাপ? আমার হাতে অচেনা এক জীব, আর তুই কিনা বলছিস — ছেড়ে দিই। দে তাহলে যাদুঘরে নিয়ে যাই।

— না, কিছুতেই দেব না!

— না খেয়ে মরে যাবে যে।

কী করা? কতবার তাকে বাটিতে করে দুধ দিলাম। আখরোট খাবে হয়তো? বাড়ির কাছেই আখরোটের ঝোপ। আখরোটগুলো এখনও কাঁচা।

— খেয়ে দেখ, চুচা।

মুখ থেকে পা সরাল সে।

হঠাৎ দেখি — নাকের কাছে লোমগুলি দুধে ভিজে জবজবে হয়ে আছে!

এবার তাহলে আর ভয় নেই!

আখরোটের একটা গোটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখল সে। ওতে পাঁচটি আখরোট, যেন পাঁচটি সবুজ তারা। অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতই পয়লা সেও সেটা শুঁকল, আর তারপর ভাল করে দেখল — ঠিক মানুষেরই মত। ফেলে দিল।

মুখ ফিরিয়ে নিল। কী অভিমান। তাকে বনে বেড়াতে নিয়ে গেলে ভালই হত। কিন্তু ভাই রেগে যাবে। ওর ভয়, পাছে জীবটি পালিয়ে যায়।

— চুচা! আমাদের মধ্যে কখনও ভাব হবে না?

একদিন ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করল:

— একলা বাড়িতে থাকতে পারবি? দিন দুয়েকের জন্য আমাকে শহরে যেতে হবে।

ভাই চলে গেল।

সন্ধের দিকে বনে বইল ঠাণ্ডা বাতাস। দমকা হাওয়ায় বনের কাছে শুয়ে পড়ল ঘাস আর ঘরের কাছে — আলুর চারা মাটিতে হল কাত। ডালে থেকে বার্চের পাতাগুলি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে অন্ধকার আকাশে। বাড়ির ছাদের ওপর শোনা গেল মেঘের গর্জন। বিদ্যুৎ চমকাল, আবার গর্জে উঠল মেঘ। শুরু হল ঝড়বৃষ্টি।

বনে ঝড়বৃষ্টি — তা ভীষণ ভয়ঙ্কর। একা থাকলে আরও বেশি ভয়ঙ্কর। মানুষ ও জন্তু — দুয়ের বেলাতেই তা সমান।

খাঁচা থেকে বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে চুচা। হয়তো, তার জীবনে ঝড়বৃষ্টি এই প্রথম?

খাঁচার দরজাটি খুলে আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে বেরিয়ে এল। বসল হাতের তালুতে — ছোট গরম গায়ের লোমগুলি এলোমেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আশ্বস্ত হলাম: আমাকেও কেউ বিশ্বাস করে, আমার কাছে আশ্রয় খোঁজে।

চুচা যেন ভুলে গেল ভয় আর অভিমান। আমি তার গায়ে হাত বুলাচ্ছি, আর সে তার গরম নাকটি লুকিয়ে রেখেছে আমার আঙুলের মধ্যে। ঠিক বেড়ালছানার মত। তখন আমাদের গলায় গলায় ভাব।

যখন ঝড় থামল, আমি জীবটিকে নিয়ে গেলাম খোলা খাঁচায়:

— যা, ঘুমো।

কিন্তু সে গেল না। ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে রইল মন দিয়ে। যেন কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে।

— কী হল, চুচা? চুচা!

হঠাৎ সে গা টান করল, উজ্জ্বল ধূসর পেটটি তার উঠল কেঁপে, এবং সে ডাকল:

— চু — চা!

ডাকটি তার আগের চেঁচামেচির মতই শোনাল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

— চুচা! চুচা! চুচা! — নিজের নতুন দক্ষতায় যেন মুগ্ধ হয়েই সে বার কয়েক উচ্চারণ করল শব্দটি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উচ্চারণই করল বৈকি।

তখন আমি ভাবলাম, যদি হঠাৎ...

— চুচা, বল তো 'মা'।

জীবটি আবার গা টান করল, বাঁকাল ছোট্ট গোলাপী জিভ:

— খ্‌মা... মা!

এবং শখ করে আবার:

— খ্‌মা — মা — মা!

সকালে ভাই এল। মোটর সাইকেল রাখল বেড়ার কাছে। কুয়োতে হাত ধুল। সিঁড়ি বেয়ে ঢুকল ঘরে।

— কি রে, তুই কেমন আছিস এখানে? ভয়-টয় পাস নি? কী যে দারুণ খিদে পেয়েছে। আলু সেদ্ধ করেছিস? লক্ষ্মী মেয়ে বটে।

কিন্তু আমার আর তর সইছিল না:

— দাদা, জানিস আমার কী আনন্দ। জীবটি কথা বলতে শুরু করেছে।

— কোন জীব?

— চুচা।

ভাই মনোযোগ সহকারে তাকাল এবং কিছু বলল না।

— বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে শোন। চুচা!

জীবটি চুপচাপ।

— চুচা, বল্: 'মা'।

ও এমনকি কানই খাড়া করল না।

— ও কিছু না, বোন, — বলল ভাই আদরের সঙ্গে। — ঝড়-তুফানে অনেক সময় তা-ই হয়। চিন্তা করিস না।

— কিন্তু ও যে বলছিল... আবারও বলবে...

— চিন্তা করিস না। এমনকি যদি বলেও থাকে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

আগে চুচা আমার কথা শুনতে চায় নি, মুখ ফিরিয়ে নিল। যেন সে বুঝতে পেরেছিল, আমার কণ্ঠস্বর বেইমানি করেছে তার প্রতি।

আর এখন!

দূরে ভাইয়ের মোটর সাইকেলের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই আমি খাঁচার দরজাটি খুলে দিলাম। বানরের মত হেলেদুলে চুচা এল আমার কাছে। বসল হাতে। সামনের পা দু'টি তুলে করতে লাগল অপেক্ষা।

সে খাবারের অপেক্ষায়, আদরের অপেক্ষায়, বিস্ময়ের অপেক্ষায়। বড় বড় চোখে দেখছে আমাকে।

দুধের বাটিটি নিলাম তার মুখের কাছে। তারপর মুছে দিলাম মুখের ধারের ভেজা লোমগুলি।

— নোংরা থাকতে নেই চুচা!

— খনোংলা!

— বল্ তো দেখি — নোংরা!

— খনোংলা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে বলতে শিখেছিল। জীবটির বাকযন্ত্র বোধ হয় ছিল ময়না বা তোতার মত।

তবে মুখস্থ শব্দগুলো সে মিছিমিছি উচ্চারণ করত না, ওগুলো যেন সে রেখে দিত কোন এক অদৃশ্য ভাণ্ডারে। এবং দরকার মত আনত বের করে।

আমি যখন জিজ্ঞেস করতাম:

— কে তুই?

ও হামেশাই উত্তর দিত:

— চুচা!

বাইরে কোন শব্দ শুনলেই গোল গোল কান খাড়া করে সে নিজেই জিজ্ঞেস করত:

— খে-ওখানে?

তারপর আমার দিকে ফিরে:

— খে-তুই?

— মা! — বলতাম আমি।

অনেকখন ধরে যদি আমি খাঁচার কাছে আসতাম না, সে ডাকত:

— খমা — মা — মা!

সহজেই সে শব্দ মনে রাখতে পারত। শব্দের উচ্চারণ শুনতে ভাল লাগত তার।

'বন-বাতাস-পাতা,' — নিজের 'খ্' ধ্বনিটি যোগ করে দিয়ে বলে সে: 'খ্বন, খ্বাতাস, খ্পাতা'। আমার পেছন-পেছন চুচা ঘুর ঘুর করে বেড়ায় সারা ঘরময়। জানলাগুলো খোলা, তবে ও যে পালাতে পারে সে ভয় আমার নেই।

ভাই বাড়িতে থাকলে চুপটি মেরে সে খাঁচায় বসে থাকে।

ঝড়ের পরে সেদিন আমাদের যে কথাবার্তা হয় সে বিষয়ে ভাই আর কোনকিছু বলল না। ভাবল — হয়তো আমার খারাপ লাগবে।

তাছাড়া বসে যে একটু কথাবার্তা বলব সে সময়ও আমাদের নেই। তো সে কুড়ুল আর পেন্সিল নিয়ে চলে যায় শুকনো গাছে দাগ দিতে: সামান্য কেটে তাতে লাগিয়ে দেয় নম্বর — কেটে ফেলা দরকার। 'ওগুলো রাজ্যির সব পোকামাকড়ে ভরে যাচ্ছে, বুঝলি?' — বোঝায় সে আমাকে। তো চলে যায় টহল দিতে: কেউ যাতে গাছপালার ক্ষতি না করে, জীবজন্তু না মারে, পাখির বাসা থেকে ডিম নিয়ে না পালায়। ভীষণ ব্যস্ত বড় ভাইটি আমার, এমনকি খাওয়ারই সময় জুটে না তার। বন যেন তাকে যাদু করে ফেলেছে, — কথায় কথায়ই বলে:

— বনের যত্ন।

— বনের উপকারিতা।

— বনের সেবা।

...খোঁয়াড়ে থাকে হরিণেরা।

যখন তারা শুনে মানুষের গলা, আসে বেড়ার ধারে, ফাঁক দিয়ে গলায় মাথা: 'দাও!'

ছোটবড় যারাই এখানে বেড়াতে আসে, তাদের খেতে দেয় লজেন্স। তবে লজেন্স হরিণদের মনে ধরে না — স্বাদ নেই মোটেই! শাদা রুটি হলে মন্দ হয় না। কালো রুটি — ভাল! নুন হলে তো কথাই নেই, কিন্তু নুন দেয় খুব কম লোকেই। অথচ তাই-ই হচ্ছে তাদের প্রিয় খাবার। নুনের জন্যে সব হরিণই পাগল।

অন্য খোঁয়াড়ে থাকে বিরাট ধূসর-বাদামী নীলগাই। পর্বত-সমান ধড়ের অনুপাতে পাগুলি তাদের ভীষণ সরু।

নীলগাইয়ের খোঁয়াড়ের কাছে যদি একটু অপেক্ষা করা যায় — তাহলে অবাড়ন্ত নীরস বার্চ আর ফারগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবে পাতলা ও লম্বা-পা লালচে এক হরিণ।

কী সুন্দর সে!

সে যখন হালকা পায়ে হাঁটে, কোন শব্দ হয় না। সরু ধড়ের ওপর মাথাটি যেন চলে নেচে নেচে। বেগুণী চোখগুলি বিরাট। কচি কচি সোজা শিঙদুটি এখনও লোমে ঢাকা।

যদি তার ধূসর গরম কানদুটি ছোঁয়া যায়, তো মাথা নিচু করে ডুব দেওয়ার ভঙ্গিতে সরে পড়ে সে।

আর যদি নুন দেওয়া যায়, তো নরম ধোঁয়াটে ঠোঁট দিয়ে তা সে হাত থেকে তুলে নেবে না, তার বদলে বরং হাতে শুধু একটু উষ্ণ শ্বাস ছাড়বে। এর মানে — পেয়ার কে লিয়ে সুক্রিয়া।

— আলিওশা!

নিজের নামটি সে জানে, তবে সাড়া দেয় না। আর কখনও-কখনও না ডাকতেই চলে আসে। সত্যিই, অদ্ভুত নয় কি!

হরিণ আলিওশা দাঁড়িয়ে ছিল একেবারে বেড়ার ধারে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল চুচাকে। চুচা বসে ছিল আমার কাঁধে। প্রথমে সে বসে ছিল আর সব জীবের মতই — চার পায়ে ভর দিয়ে। কিন্তু এখন অবাক হয়ে সে সামনের পা দুটির ভর ছেড়ে দিল ও একটি দিয়ে আঁকড়ে ধরল আমার কান।

— চিচু — চিচু! — ডাকল সে।

অনেকদিন আমি তার চিঁচিঁ ডাক শুনি নি। হরিণের বিরাট-বিরাট চোখের পলকহীন দৃষ্টি চুচার ওপরই নিবদ্ধ, নরম ঠোঁটগুলি তার নড়ছে। আর চুচা নানা সুরে ডেকেই চলেছে — তো করছে চিঁচিঁ, তো — চিচু-চিচু।

দেখলে তো, কতকিছুই সে পারে!

হরিণ আর চুচার মধ্যে জমে ওঠে দিলখোলা বুনো আলাপ। কিন্তু কী বিষয়ে?

ঝরণার ধারে দেখা হলে জীবজন্তুরা কী নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাতচিত করে?

আর গাছে-গাছে কী নিয়েই বা কিচির-মিচির করে পাখিরা? কখনও-সখনও আমি বুঝি: 'হুঁশিয়ার! মানুষ আসছে!'

কিন্তু মানুষ যখন নেই?

বুনো পথ দিয়ে যাচ্ছি আমি বাড়ির দিকে। চুচা হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছে আমার হাতের তালুতে।

— হরিণ কী বলল, চুচা?

জীবটি গা টান করল, বুজল চোখ।

— হরিণ, হরিণ — বলে সে।

— ভাল কথা, কী নিয়ে তোদের আলাপ হয়?

— বুনো। বুনো! — করুণ সুরে গেয়ে উঠল চুচা। — বন-বাতাস-পাতা-হরিণ...

বুঝলাম সবকিছু। এই সাক্ষাতে চুচার চোখে ধরা পড়ে বনের আসল রূপ। তার দুর্গম ঝোপঝাড়, জন্তু-জানোয়ারের গর্ত, পায়ে-চলা গোপন পথঘাট...

ভাই এল।

— আমার এলাকায় নেকড়ে পড়েছে! — বলল সে। — শিকারী কালই দেখেছে মর্দা একটাকে।

— মর্দা একটা মানে? — বুঝলাম না আমি।

— মানে, পাঁচ-ছ' মাসের জোয়ান নেকড়ে আর কি। জন্তু-জানোয়ার মারতে শুরু করেছে। বেটাকে পাকড়াতে হবে।

— কী করে?

— জানিস না? — অবাক হয় ভাই। — খুবই সোজা। বন্দুকে গুলি ভরে শিকারী ওত পেতে বসে থাকবে ফার বনে আর... — মাথা তুলে সে হাতের তালু দু'টি লাগাল ঠোঁটে। এবং হঠাৎ শোনা গেল নিঃসঙ্গ এক নেকড়ের করুণ আর্তনাদ। — এই ভাবে, — হেসে ফেলল আমার বনরক্ষক। — আর নেকড়ে তখন দেবে জবাব। আসবে কাছে।

তখন সহসা হাতের ওপর আমি গরম কোনকিছু অনুভব করলাম — এটা চুচা। হাত ঘেঁষে রয়েছে সে ও ভয়ে কাঁপছে। কী এর মানে? ভাই যখন বেরিয়ে গেল, জীবটি জিজ্ঞেস করল:

— খুকে?

— কে অমন করে ডাকে? নেকড়ে।

— খ্নেখরে, খ্নেখরে... — বলেই সে চুপ মেরে গেল।

এবার বুঝলাম ব্যাপারটি। তার মানে নেকড়ের ডাক চুচা বনে আগেও শুনেছে। আর ভাই কিনা বলছে — নেকড়েরা সবে এসেছে।

— নেকড়ে কী তুই জানিস, চুচা?

— খ্হাঁ, খ্হাঁ!

— জানিস, আমি এক মতলব এঁটেছি। তুই ভাইকে দেখিয়ে দিবি কোথায় নেকড়েরা থাকে। আর ভাই ওদের দেবে খতম করে।

চুচা সোজা হয়ে বসে মন দিয়ে শুনল আমার কথা। বার কয়েক আমি একই জিনিস বললাম। এবং সে বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

— নেকড়েরা বজ্জাত, — বললাম আমি। — আলিওশার মত হরিণদের ওরা মেরে খেয়ে ফেলে। চুচা, তুই দেখিয়ে দিবি ওরা কোথায় থাকে।

চুচা এক লাফে চলে গেল খাঁচায়। জড়সড় হয়ে বসে রইল কোণায়। আমি তাকে ডাকলাম, কিন্তু সে এমনকি ফিরেও দেখল না।

আবার আমি ভাবলাম: সে এমনকিছু জানে যা আমি জানি না। আমাদের ভাষা যদি এক হত তাহলে তো কোন কথাই ছিল না: বনের ভাষা সে অনুবাদ করে দিত আমাদের অর্থাৎ মানুষের ভাষায়। তখন সবাই আমরা — মানুষ আর জন্তু — বুঝতে পারতাম পরস্পরকে। সবকিছুই কত সহজ হতে পারত! কিন্তু তা কি আর হয়।

কী সে দেখল?

কী সে জানে?

কী গোপন করছে?

কে তুই, চুচা? কে তুই?

দ্বিতীয় অধ্যায়

চুচার পরিচয়

(চুচার প্রথম জীবন)

চুচার চোখ ফুটল বসন্তের এক সকালে। প্রথমেই সে দেখতে পেল ধূসর-বাদামী আঁশে-ভরা দেয়াল। ব্যস, আর কিছু নয়। পাইন গাছ দেখতে কেমন হয় তা সে জানত না, এবং ভাবল এটাই সারা পৃথিবী: ধোঁয়াটে, তবে বেশ মজার। আঁশ থেকে আঁশে হেলেদুলে চলছে লাল কালো এক পোকা; একটু নিচে ঝুলছে কিসের গোঁফ। অথবা গোঁফ না হয়ে ঠেং-ও হতে পারে। চুচা ধরতে চায়, থাবা বাড়ায়, কিন্তু তক্ষুণি লাল-কালো পাখা সোজা হয়ে ওঠে, ও পোকাটি দেয় ওড়া। চুচা তাকিয়ে থাকে তার পেছন পানে এবং অলক্ষিতে পাশ ফেরে। তখন একফালি রোদ এসে পড়ল তার ওপর, বাতাস লাগল গায়ে, দেখল সে রঙবেরঙের গাছপালা, পেল সৌরভ। চুচা চোখ কুঁচকাল।

আর যখন চোখ একটু খুলল, একেবারে কাছেই মাটিতে দেখতে পেল আরও একটা পোকা — লালচে, পেটটা টান-টান, সামনের পাগুলোয় হলদে কাঁটা।

— এই খুদে জন্তু! — চেঁচিয়ে ওঠে চুচা। (জন্তুরা জন্ম থেকেই কথা বলতে পারে তাদের বুনো ভাষায়, মানুষ কিন্তু তা পারে না)।

কী সে বলল আমরা হলে তা বুঝতে পারতাম না, তবে পিঁপড়েটি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিল, কিন্তু উত্তর দিল না, গোঁফ নাড়াল শুধু। সবাই জানে যে পিঁপড়েরা খুব পরিশ্রমী এবং সেই জন্য অসম্ভব দেমাক তাদের।

তখন ধূসর পেট ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুল চুচা। দেখতে পেল মোটা মোটা হলদে ডাল, আর ডালে — গোছা গোছা লালচে কাঁটা।

ডালগুলি হেলছে-দুলছে বাতাসে। হঠাৎ লালচে একটা গোছা এক নিমেষে পেরিয়ে গেল অন্য এক ডালে... তাজ্জব ব্যাপার! আরে না, এটা কাঁটার গোছা নয় মোটেই, এ যে লালচে জন্তুর লালচে লেজ।

গাছের কাণ্ডে ঠিকমত গা-ও ঘেঁষতে পারে নি চুচা — আর লালচে জীবটি কাছে এসে হাজির। পাইন গাছের কাণ্ডে ঝুলছে উপুড় হয়ে।

— বেশ তো! — লম্বা লম্বা ও চিকণ চিকণ দাঁত দেখিয়ে বলে জীবটি। — বেশ মজার পুতুল তো! এই কে-রে তুই?

— জানি না, — বলে চুচা।

— তা কে তোর মা?

— জানি না।

— এখানে থাকিস?

— মনে হয় এখানেই।

— হয়তো তুই ইঁদুর? তাহলে লেজে এত লোমই বা কেন? বেশ, থাবাগুলি দেখা তো?

পেছনের পায়ে ভর দিয়ে বসে চুচা সামনের পাগুলি বাড়াল।

— অমন জীব কখখনো দেখি নি। তোর থাবাগুলি মানুষের হাতের মত। ছিঃ ছিঃ, কী কদাকার প্রাণী তুই! পুতুলই বটে! নখগুলোও নরম। আমার এই গাছে উঠতে পারবি?

— জানি না।

— চেষ্টা করে দেখ্ না একবার। ওপরে কিন্তু খাসা লাগবে!

জীবটি সহজেই ডাল বেয়ে ছুটে গেল শেষ অবধি এবং হঠাৎ এক ঝাঁপ — পেঁৗছে গেল অন্য গাছে, তারপর উঠতে থাকে ওপরে, আরও ওপরে, দুলল ডালে এবং আবার — ঝাঁপ! বারবার ডাকে চুচাকে, দেখায় লোভ:

থাকি আমি গাছের ডালে,
তাতে দোলনা আছে কত!
থাকি আমি গাছের ডালে
কাঠ-বেড়ালীদের মত,
কান আমার খাড়া খাড়া,
লাফটি আমার খাসা।
আয় রে আয়, আয় ছুটে আয়,
যদি দেখবি আমার বাসা!

ভয়ে আর আনন্দে চুচা থর্থর কাঁপছে। এমন সুন্দর প্রাণীর সঙ্গে দোস্তির কথা কল্পনাই করা যায় না। তাকে ভালভাবে একটু দেখা যাক... তাতে সে নারাজ হবে না নিশ্চয়ই।

এমন সময় এসে হাজির হল আরেকটি জীব। জীবটি হলদে, নরম, বড়সড়, তবে বয়স তার বেশি নয়। হাস্যকরভাবে মোটা মোটা থাবা ফেলে অন্ধকার ফারবন থেকে সে ছুটে বেরল চুচার মাঠে। তার ছোটার বেগ দেখে মনে হল সে যেন উড়ে এসে পড়ল। জন্তুটি বাচ্চা কাঠঠোক্‌রাটির পেছন পেছন না ছুটলে চুচাকে দেখতেই পেত না। বাচ্চা কাঠঠোক্‌রাটি উড়তে শেখে নি তখনও, উড়ার জন্যে ডানা ঝাপটাচ্ছে শুধু। মাটির উপর ডিগবাজি খেতে খেতে সে ধাক্কা খেল চুচার সঙ্গে।

হলদে ঠোঁটওয়ালা ও বেঁড়ে এই জীবটিকে দেখে ভয় পেল না চুচা, তবুও এক লাফে উঠে গেল পাইন গাছে — সাবধানের মার নেই। কাবু করে ধরতে পারে না সে, এবং উঁচু থেকে তাকাতেই তার পিলে গেল চমকে।

তখনই মুখ খুলল কমবয়েসী জন্তুটি, জিভ বের করে বড় বড় চোখে দেখতে লাগল চুচাকে। পাখির ছানাটির কথা সে একদম ভুলে গেল।

— এই, তুই বেটা কে-রে?

— জানি না, তবে ওই লালচে জীবটি...

— আচ্ছা, ওই কাঠবেড়ালী?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বলে আমি নাকি ইঁদুর।

— সবকিছুতেই কাঠবেড়ালীর বেশি বাড়াবাড়ি। 'ইঁদুর' কী তা আমার জানা নেই, তবে দেখতে তুই ইঁদুরের মত নস। নেমে আয়।

চুচা কিন্তু নড়ল না।

— আর তুই কে?

— আমি — নেকড়ে। যখন আমি বড় হব, তখন সবাই আমায় নেকড়ে মামা বলে ডাকবে। আমার বাপ-দাদাকেও এই বলে ডাকা হয়। থাকি আমরা ওক বনের পেছনে। তুই আমাকে এখন থেকেই মামা বলে ডাকতে পারিস। তোর পাশে আমি কিন্তু ঢের বড়। আচ্ছা, তাহলে নাম এবার।

নীল হয়ে যাওয়া আঙুলগুলি আলগা করে চুচা কোনমতে লাফিয়ে পড়ল ঘাসে — ধপ্‌। উঠতে পারার আগেই নেকড়েছানা থাবা দিয়ে তাকে হালকাভাবে একটু দেবে দিল।

— এই, এই অসৎ! — উপর থেকে চেঁচাল কাঠবেড়ালী। — ছুঁবি না বলছি আমাদের বনের পুতুলকে।

— কই, আমি তো ছুঁইছি না।

— চুপ রো, বেটা মিথ্যুক! তোর খুব লেগেছে, বনের পুতুল?

— কিছু না, — পাশের এলোমেলো লোম চাটতে চাটতে বলল চুচা।

— সাবধান বলে দিচ্ছি, নেকড়ে হারামজাদা! — কাঠবেড়ালী রেগে আগুন।

— ও একটু তামাসা করেছে! — জোরে চেঁচিয়ে উঠল চুচা। এবং সত্যিই তার হাড়গোড়ে আর ব্যথা নেই মোটেই।

— খাসা ছোকরা তুই, — বলে নেকড়েছানা। — চল্‌, তোকে শুয়োর দেখাব।

ছোট ছোট ফারগাছের তলায় একেবারে অন্ধকার আর ভীষণ গ্‌মোট। মাটি থেকে উঠছে শ্‌কনো পাতার তীব্র গন্ধ, হাওয়ায় তাজা রজনের সৌরভ।

হালকা পায়ে এগ্‌চ্ছে নেকড়েছানা, ডালপালা সরাচ্ছে সাবধানে যাতে শব্দ না হয়, সামনের পায়ে খ্‌ব লেংড়াচ্ছে, মাথা তার ছ্‌ইছে মাটি।

নেকড়েছানা আরও এগ্‌ল, তারপর থামল কিসের এক বড় স্ত্‌পের কাছে। স্ত্‌পটি গিজগিজ করছে, নড়ছে, কিলবিল করছে।

— এটা কী? — জিজ্ঞেস করে চুচা।

— পিঁপড়ে। ভীষণ বজ্জাত এরা! — এই বলেই পেছনের পায়ে স্ত্‌পে মারে এক লাথি।

— ওদের মারছিস কেন? ওরা যে তোকে ছোঁয় নি।

— একবার থাবাটি দিয়ে দেখ্ না। দেখ একবার!

চুচা থাবাটি ভেতরে ঢুকাল বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গেই তা বের করে ঝাড়তে লাগল। কয়েকটি কালো পিঁপড়ে পড়ল গিয়ে ঘাসে, আর তার গোলাপী থাবায় রইল লাল লাল দাগ।

— ব্‌ঝলি?

— এবার ব্‌ঝেছি।

— আর প্রজাপতি কিংবা ফড়িং যদি ওদের পাল্লায় পড়ে তো একদম সাবাড় করে ছাড়ে।

ফারের ডালের নিচে হামা দিতে দিতে আরও খানিকটা এগিয়ে গেল তারা।

— শ্‌নতে পাচ্ছিস? — চুচার দিকে ম্‌খ ফেরায় নেকড়েছানা।

চুচা কোনমতে চলছিল। হলদে লেজ ছাড়া কিছ্‌ই তার চোখে পড়ল না।

— শ্‌নতে পাচ্ছিস? — বাতাস শ্‌ঁকল নেকড়েছানা। — এখান দিয়ে শ্‌য়োরেরা গেছে।

হঠাৎ ফার বনের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ল একফালি হলদে গরম রোদ। দেখা গেল — সামনেই সরস সব্‌জ ঘাসে-ঢাকা উজ্জ্বল মাঠ। মাঠটি ভরে আছে শাদা প্রজাপতিতে আর শাদা-নীল-হলদে ফুলে।

— চেয়ে দেখ্! — উষ্ণ নিশ্বাস ফেলে নেকড়েছানা।

মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছে লম্বা-নাক পাকা-লোম ধ্‌সর-বাদামী এক ব্‌নো শ্‌য়োর। আর তার পেছন পেছন চলছে গায়ে খয়েরী ডোরা-কাটা লালচে শ্‌য়োরছানারা, — ঘাসের মধ্যে ওদের প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

— বাঃ, কী স্‌ন্দর! — অবাক হয় চুচা!

সে আর চোখ ফেরাতে পারে না।

— আচ্ছা নেকড়ে মামা, এই বাচ্চারাও পরে ধোঁয়াটে রঙের হবে?

চুচা বসে আছে পেছনের পায়ে, আর সামনের থাবা দিয়ে ধরে রেখেছে একগোছা ঘাস।

— অবশ্যই, — মাথা নাড়ে নেকড়েছানা। — আমিও ধোঁয়াটে রঙের হব।

মাঠটা ততক্ষণে খালি হয়ে গেছে, তবে তারা বসেই রয়েছে — থেমে থেমে নাকের ফুটো ফুলিয়ে নিচ্ছে শ্বাস। তারপর নেকড়েছানা তার মোটা হলদে থাবাগ্‌লি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে

তাতে মাথা রেখে পড়ল শুয়ে। চোখদুটি তার ছোট হয়ে এল — যেন দু'টি কালো ফুটো আর কি।

— বনের গান শোন্, — বলে সে। — শুয়ে পড় ঘাসে, তাহলে ভাল শুনতে পাবি।

চিৎ হয়ে শুয়ে চুচা তাকিয়ে রইল পাইন অ্যাশ আর বার্চের মিলে-যাওয়া চুড়োর পানে...

'শা-শা-আ-আ,' — ভাসে বনের ওপর।

'উই-চক-চক,' — শোনা যায় ঝোপঝাড়ে।

'স্কা-স্কা-স্কা,' — জবাব আসে ঘাস থেকে। আর এই সমস্তকিছু মিশে গেল একটি গানে, এবং চুচা শুনতে পেল:

— আমার আছে হরিণ আর শেয়াল, — বলে বন। — ডালে আছে টেরা-টেরা বনবেড়াল।

বন গাইছে:

আমার আছে বেরি লাল লাল,
লালচে কাঠবেড়াল।
আছে শত নদীনালা,
এসে দেখো তার তরঙ্গমালা।
পুকুরে আছে মাছেদের পোনা,
তীরে এসে জল খায় হরিণের ছানা।

— এ সবকিছু সত্যি? — জিজ্ঞেস করে চুচা।

কিন্তু নেকড়েছানা উত্তর দিল না। তার পেটটি সমতালে অনবরত উঠা-নামা করছে, শাদা-ধুসর রোঁয়ায় ভরা ভারি একটি কান গেছে গুটিয়ে, শুকনো নাকের চারিদিকে ভন্‌ভন্ করে উড়ছে এক মাছি। চুচা মাছিটাকে তাড়াল।

'কী সুন্দর! — ভাবে চুচা। — কী সুন্দর!'

চুচা এখন যেখানেই থাকে না কেন সে শুনতে পায় বনের গান। বুঝতে পারে সমস্ত নতুন নতুন শব্দ। এবং জানে, সবই তা সত্য। বন বলে:

আমার আছে পাইন আর ওক গাছ,
আমার আছে জল আর মাছ,
আছে পুকুর আর নদী-নালা,
তাতে দেখি মাছেদের খেলা।
আছে মিষ্টি মিষ্টি বেরি,
সবুজ ঘাস, আর অ্যাশের বন!

শুকনো পাইনের কাঠবেড়ালী চুচাকে দেখিয়ে দেয়, ডালপালায় ঢাকা সবুজ ঘরে বাদামেরা কীভাবে লেগে থাকে গায়ে গায়ে। কাঠবেড়ালী ওগুলো নিয়ে যায় তার বাসায়, আর চুচা তাকে করে সাহায্য।

দেখল সে প্রচুর লাল ও ধোঁয়াটে কালো জাম, খায় আর অবাক হয় বনের উদারতায়। মাটি ফুঁড়ে কীভাবে উঠে আসে ঘাসের ফিকে ফিকে অঙ্কুর, তা দেখে তার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

একদিন পাইন গাছে তাকাতেই দেখতে পেল ছোট্ট একটি আঁশ। হঠাৎ তা ঝলমল করে উঠল — তা থেকে বেরতে লাগল প্রথমে নীল, আর পরে লাল আলো।

চোখ পিটপিট করে চুচা, এবং আলো হয়ে উঠে ঘন নীল, কড়া হলদে, কমলা-রঙা।

— ওটা কী?

— দেখতে পাচ্ছি না, খোকা, — জবাব দেয় শুকনো পাইনের কাঠবেড়ালী।

— আরে ওই যে ওটা, গাছের ছালে। এক্ষুণি থাবা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলবি!

— ও কিছুই না, গাছের রস। একটু চেটে দেখ না। তাতে দাঁত শাদা আর শক্ত হবে।

সত্যিই, এই রসের ফোঁটাই ঝলমল করছিল।

তখন চুচা নিজেই বনের গানের সঙ্গে জুড়ে দিল আরও কয়েকটি কথা:

মিষ্টি তোর গাছের ফল,
সবুজ তোর নবপল্লবদল...

এবং বনও সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে উঠল — যেন তারই কথা এগুলি:

মিষ্টি আমার গাছের ফল
সবুজ আমার নবপল্লবদল!..

— গানের এই কথাগুলি কিন্তু আমার, — ভয়ে ভয়ে বলে চুচা।

— বাজে বকিস না তো! — রেগে যায় কাঠবেড়ালী। — কী হামবড়াই!

তবে নেকড়েছানা সঙ্গে সঙ্গেই তা বিশ্বাস করল:

— সাবাস! তোর কিন্তু বুদ্ধি আছে! আয় আমার সঙ্গে, হরিণেরা কোথায় জল খায় তোকে দেখিয়ে দেব।

আবার তারা ছুটল ঘন ঝোপের ভেতর দিয়ে, জলার পাশ ধরে। চারিপাশে বার্চের ঘন বন। জড়শুদ্ধ পড়ে রয়েছে লম্বা ফারগাছগুলি: জলা মাটি তুফানের সময় সামলাতে পারে নি এদের। নল-খাগড়ার গন্ধে ভরা এই জায়গাটায় খুরে তৈরি ছোট ছোট প্রচুর গর্ত।

— হরিণ! — গর্ত শুঁকে বলল নেকড়েছানা।

— বনের খবর তুই-ই জানিস সবার চেয়ে বেশি, — কতবার যে এ-কথাটি বলে চুচা।

— সব জন্তুই জানে। অবশ্য তুই ছাড়া, — খ্যাঁক করে নেকড়েছানা।

তারপর খসখসে জিভ দিয়ে চেটে দিল চুচার ধূসর মুখ। আর কেউ-ই তো কখনও নেকড়েছানার এত প্রশংসা করে নি।

এইভাবে চলে গ্রীষ্ম। ঝোপ থেকে একদিন ফড়ফড় করে উড়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট এক পাখি —

নাম তার ভারুই। এক গরমে সে ডিম ফুটিয়েছে দু'বার। বাচ্চারা এখন বড় হয়ে গেছে। তাই তো সে উড়োউড়ি করছে ডাল থেকে ডালে। এর মানে, বাচ্চাদের নিয়ে ঝামেলা শেষ হয়েছে, এবার গান গাওয়া যেতে পারে।

সে গাইতে লাগল:

বনে আসে গ্রীষ্ম, পড়ে গরম।
কখনও হাসে সূর্য, কখনও হয় বৃষ্টি!
নলখাগড়ার বনে বেড়েছে হাঁসের ছানা,
হলদে রোঁয়া পড়ে উঠেছে তার পালক।
হরিণছানা টের পেল
মাথায় তার গজিয়েছে দুই শিং।
আর শেয়ালছানা করেছে শিকার,
গর্তে এনেছে একটি ইঁদুর।

সত্যিই তাই। তবে ভারুই এতকিছু জানল কোত্থেকে? সারা গরমই তো সে কাটিয়েছে বাচ্চাদের সঙ্গে?! না, বনের সব পশুপাখিই এসব জানে। তাছাড়া, ভারুইরা আবার গানেও ওস্তাদ।

তখনই চিন্তা হল শুকনো পাইন গাছের কাঠবেড়ালীর।

— তুই এখন বড় হয়েছিস, কিন্তু তোর পাগলামি গেল না! — বাসা থেকে সে চেঁচিয়ে বলল চুচাকে। — আমার বাচ্চারা এখন আমার চেয়েও সেয়ান। আর তুই? নখগুলিও তোর নরম।

— ওগুলি শক্ত না হলে আমি কী করব? — দুঃখ করে চুচা।

— তাহলে সেয়ান হওয়া দরকার। জোর যখন নেই তখন সেয়ান তো হবি। আর তুই কিনা তোর সাধের নেকড়ে মামার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছিস। এতদিনে ও তোকে কী শিখিয়েছে শুনি?

— ও আমাকে বনের গান শুনতে শিখিয়েছে।

— আরে দূর আহাম্মক! — খেপে যায় কাঠবেড়ালী। — ওতে শিখবার কী আছে? সব জন্তুই বনের গান শুনতে পায়, সময়-সময় এমনকি মানুষও। ও তোকে বনের নিয়ম বলেছে?

— না।

— এবং বলবেও না।

— কেন?

— কারণ ওর দিল সাচ্চা নয়। ও বনের নিয়ম মেনে চলে না। ও হল একটা দস্যু।

— ও দস্যু নয়। কাউকেই ছোঁয় না। আর ওই পিঁপড়েরা...

— পিঁপড়েরা কি? — শোধায় কাঠবেড়ালী।

— পিঁপড়েরা বনের নিয়ম মানে?

— অবশ্যই।

— ওদের বাসায় থাবাটি একবার দিয়ে দেখ না।

— বাঃ, কামড়াবেই তো। আমার বাসায়ও কেউ থাবা দিয়ে দেখুক না, আমিও কামড়ে দেব, — রাগের সঙ্গে বলে কাঠবেড়ালী।

— আর প্রজাপতি? প্রজাপতি যখন পিঁপড়েদের সঙ্গে সই পাতাতে আসে? — নেকড়েছানা যা বলেছিল চুচার তা ভাল মনে আছে।

— ওটা ওদের খাবার।

— সে আবার কী! — রেগে যায় চুচা। — পিঁপড়েরা বনের নিয়ম মাফিক মেরে খায়, আর নেকড়ে মামা...

— ও এখনও ছোট, — থামিয়ে দেয় কাঠবেড়ালী এবং খুব ঝাঁকালো সুরে বলে: — এমন দিন আসবে যখন তোর নেকড়ে মামাও তার বাপ-মায়েরই মত অন্যদের মেরে খাবে...

— ও এর মধ্যেই... — চুচা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থাবা দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। সত্যিই তাই ঘটেছিল।

অ্যাশের ডালে ছোট্ট অ্যাশ-বাবুইয়ের বাসা (অ্যাশ গাছে থাকে বলে সবাই তাকে এই নাম দিয়েছে। পশুপাখিদের মধ্যে নাম দেওয়ার রীতিটাই এরকম)। এই প্রথম বাবুইয়ের ডিম ফুটল, বাচ্চা হল, বাড়ল সংসারের ঝামেলা। সকাল থেকে সন্ধে অবধি একটু জিরানোর সময় নেই তার।

চুচা কখনও নেকড়ের ডেরা দেখে নি। নেকড়েছানা একদিন তাকে করল নেমন্তন্ন।

তিড়িং তিড়িং লাফে চলছে তারা সবুজ মসৃণ অ্যাশ আর বুড়ো ওক গাছের পাশ দিয়ে। হঠাৎ থেমে গেল নেকড়েছানা।

বিরাট এক ওকের জড়ের কাছে, একফালি রোদে ঝিমুচ্ছে অ্যাশ-বাবুইয়ের এক ছেলে।

নেকড়েছানা চোখের ইশারায় চুচাকে দেখাল বাচ্চাটি, নিঃশব্দে এক পা বাড়াল। আরও এক পা, আরও... ডালে হতাশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল মা, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ভারি থাবা একবার পড়ল আর উঠল।

ছোট্ট, কচি বাবুইছানা পড়ে রয়েছে মাটিতে; লেজটি তার এলোমেলো, কালো ঠোঁটটি ছড়ানো, মাথাটি এলানো।

মা-বাবুই কাঁদতে কাঁদতে নামল নিচের ডালে, পড়তে লাগল শুকনো ডাল আর পাতা।

মাথা নিচু করে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে আছে নেকড়েছানা।

— এ কী করলি? — চেঁচিয়ে উঠে চুচা। মুখটি তার কাঁপছে।

— কী করলাম? — অবাক হয় নেকড়েছানা। — হঠাৎ হয়ে গেছে।

— হঠাৎ নয়! হঠাৎ নয়! — চেঁচায় মা-বাবুই। তার চিৎকার শুনে উড়ে এল তার বোনেরা।

— তুই তোর বাপের চেয়েও বেশি বজ্জাত! — সবাই বলে একসঙ্গে। — তোর মায়ের চেয়েও পাজি। দাঁড়া না বাছাধন, তোর দস্যুগিরি বের করছি।

— আমরা সব পাখিরা তোকে অভিশাপ দিচ্ছি। মানুষ যখন তোর খোঁজে আসবে, আমরা তাদের বলে দেব কোথায় তুই থাকিস! বেটা ছোটলোক!

না, চুচা কাঠবেড়ালীকে এসব বলল না। তার খুবই খারাপ লাগল: কাঠবেড়ালী তো ঠিক কথাই বলছে।

— বনে খারাপ যতকিছু রয়েছে, — রাগে বলে কাঠবেড়ালী, — সবকিছুই নেকড়ের নামে। বিষাক্ত জামকে বলা হয় — নেকড়ে জাম। ওগুলো প্রথমে হয় লাল, পরে কালো। বিষাক্ত পাতাকে বলে — নেকড়ে পাতা। ওই যে ওগুলো। এমনকি খরায় দুর্ভিক্ষ হলেও কোন জন্তু ওগুলো খাবে না।

নরম সবুজ বিষাক্ত পাতা নড়ে উঠল বাতাসে।

— ঠিক আছে, যা ইচ্ছে করুক গে, — বলে চুচা।

দূর থেকে ভেসে এল পরিচিত গলা। ওটা নেকড়ের ডাক:

উ-উ-উ! জানে শুধু পাইন আর ওক, —
জানে শুধু পাইন আর ওক,
গুরুজনরা শুধু করে বকবক।
আমার আছে অনেকগুলো দাঁত,
আমার আছে ধারাল দাঁত।

এটা ছিল তার গান। গানে — প্রতিহিংসার সুর।

— আবার কোন কুকীর্তি করেছে! — গরগর করল কাঠবেড়ালী। সে-ও হামেশা দূর থেকে শুনতে পায় নেকড়েছানার চিৎকার। তার মধ্যেও ভালবাসা আর বিদ্বেষ খুব প্রখর।

— আমি বড় হয়ে গেছি, — বলে নেকড়েছানা। — আর এই দেখ! — মাথাটি নোয়াল সে, তার কাটা কানে চুচা দেখল রক্ত। — একেই বলে — শিক্ষা পাওয়া।

— কিছু হয় নি, — সান্ত্বনা দেয় চুচা। — তবে আমাকে কিন্তু কেউ কামড়ায়ও না, শিক্ষাও দেয় না। আর শুকনো পাইনের কাঠবেড়ালী বলে, আমি নাকি কমজোর এবং সেয়ান নই।

— হ্যাঁ। তোর নখগুলিও নরম।

— তাহলে কী করা?

— দেখা যাক, বন কী বলে।

— বন তো আমার কথা কখনই বলে না।

— তবে নেকড়েদের নিয়ে সে গানও গায়। চল্, ঝড়ে উপড়ে-পড়া বনে যাওয়া যাক। ওখানে অন্ধকার ও সবকিছু ভাল শোনা যায়।

সত্যিই তাই। ওক বনের পেছনে পড়ে-থাকা শেওলা-ধরা ফার আর পাইনের মধ্যে সবকিছুই নেকড়েদের কথা বলে; থোকায় তাদের ডেরা, থোকায় পড়ে আছে হরিণ আর অন্যান্য জীবজন্তুর শাদা হাড়গোড়...

বন গায়:

ধোঁয়াটে আমার ফার,
জলভরা গিরিখাত,
নেকড়েরা পায় পূর্ণ আহার...

— যখন বরফ পড়বে আমি একাই শিকার শুরু করব, — নিঃশ্বাস ফেলল নেকড়েছানা। — তবে তা খুব শিগগির নয়।

একদিন পড়ে-থাকা ফারগাছের কাছে বেরি ঝোপের মধ্যে চুচা শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছে। এখানেই তার মুলাকাত হয় বন্ধুর সঙ্গে। তবে এদের একসঙ্গে দেখলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে ও চেঁচায় শুকনো পাইন গাছের কাঠবেড়ালী। সকালের ঠাণ্ডায় আর দুপুরের গরমে একটু নেতিয়ে পড়ে বেরির পাতা। চুচা শুনতে পেল, বেরি ঝোপের মধ্যে কীভাবে চলাফেরা করছে মাকড়সা ও বুনছে জাল।

— আমার আছে মাকড়সার জাল, — বলে বন।

— কচি কচি ঘাস আর গাছ-পাতা-ডাল, — বলে বন।

চুচা চোখ বন্ধ করে ফেলে; লাল লাল বিলবেরি, বার্চের উজ্জ্বল-হলদে পাতা, ম্যাড়মেড়ে টুপিওয়ালা হলদে-বাদামী মোটা-পা বেঙের ছাতা — সবকিছুই তার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয় নিজের মাঠ থেকে এই বেরি ঝোপে ছুটে আসার সময়। হঠাৎ সে থেমে যায়!

চুচাকে কী যেন ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ খুলে, লাফিলে উঠে... তক্ষুণি তার পাশ ছুঁল তীব্র দুর্গন্ধময় কী একটি প্রাণী। চুচা টের পেল, প্রাণীটি যেন তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে...

— চি-চু! — চিঁচিঁ করে চুচা। তার পাশগুলিতে ভীষণ ব্যথা হয়। সে আর চিঁচিঁ-ও করতে পারছে না, শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। কানে কিসের শব্দ, মনে হল কাঠবেড়ালী যেন নেকড়েছানাকে ডাকছে।

— নেকড়ে! নেকড়ে!

প্রাণীটি চুচাকে মুখে নিয়ে ছুটতে লাগল ফার-বনের ভেতর দিয়ে — নিচে তার চোখে পড়ল ঘাস, পাতা, ডালপালা। ওসবও যেন দ্রুত ছুটছে। প্রাণীটি হঠাৎ চুচাকে ছেড়ে দিল।

পড়ে যায় সে, ফারের মোচায় লেগে খুব চোট পায়। পাশের ঝোপঝাড়ে শোনা যায় মড়মড় মটমট শব্দ। পরে শব্দটি দূরে চলে যায় — প্রায় শোনাই গেল না আর।

— উঠে পড়, খোকা, — কাছে এসে কানে কানে বলে শুকনো পাইনের কাঠবেড়ালী।

একমাত্র এই চেঁচানে কাঠবেড়ালীই এত আদরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তবে তা ঘটে ক্বচিৎ। সামনের বাঁ থাবা দিয়ে চুচাকে জড়িয়ে ধরে কাঠবেড়ালী উঠতে থাকে গাছে — ছুটে ডাল থেকে ডালে। বাঃ, কী মজা!

কাঠবেড়ালীর সঙ্গে এইভাবে উড়বে — এটা চুচার চিরদিনের স্বপ্ন। এবার তার স্বপ্ন সফল হল, এবং গায়ে ব্যথা থাকা সত্ত্বেও সে সুখী। 'আমি যেন কাঠবেড়ালীর ছানা!' — ভেবে তার আনন্দ হল।

কাঠবেড়ালী চুচাকে নিয়ে যায় নিজের বাসায় — বাইরের দিকে ঝুলছে কাঁটা-ভরা ডালপালা আর ভেতরে বিছানো নরম লালচে লোম।

— আমার এখানে থাক। — আবার রাগী গলায় বলে কাঠবেড়ালী। — নেকড়ে দস্যুদের ডেরায় গিয়েছিলি নিশ্চয়ই।

— তুই বুঝি নেকড়েছানাকে সাহায্যের জন্যে ডাকিস নি?

— তোর জন্যে ডেকেছি। নিজের জন্যে হলে ডাকতাম না।

— ও সাহায্য করেছে?

— তা আবার করবে না! শেয়াল তাড়াতে ওর কী মজা!

— ওটা কি শেয়াল ছিল?

— তুই কি দেখিস নি? কী রে, ঘুমুচ্ছিলি নাকি?

— হ্যাঁ।

— পরের মাঠে?

— হ্যাঁ।

— তুই তাহলে একটা বোকা জীব। আজব ও বোকা। নখগুলি নরম, চোখগুলি চটপটে নয়। বাঁচবি কী করে?

— আমার তো ইয়ার-দোস্তরা রয়েছে, — বলে চুচা।

— হ্যাঁ, আমি অবশ্য তোর বন্ধু, — চেঁচায় কাঠবেড়ালী। — তবে নেকড়ে — বন্ধু নয়।

— কেন? ও যে আমাকে বাঁচিয়েছে।

কাঠবেড়ালী উত্তর দেয় না।

— তোর সঙ্গে মিলে বাঁচিয়েছে আমাকে, — যোগ করে চুচা।

— সে অন্য ব্যাপার। কিন্তু তোর দুর্গতির জন্যে তো ও-ই দায়ী। ও না হলে তুই বনের জীবন জানতিস, ছুটোছুটি করতে পারতিস, গাছে চড়তে আর পালাতে শিখতিস। আর তুই এখন কী কাজটা করতে পারিস শুনি? কী-ই বা শিখেছিস?

— আমি বনের কথা জানি। আর বাতাসের সঙ্গে গান গাইতে ভালবাসি।

— আরে চুপ কর, বেটা আহাম্মক। — রেগে উঠে কাঠবেড়ালী। তারপর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, — ঠিক আছে, এবার ঘুমো তো দেখি।

কাঠবেড়ালীর কথায় আপত্তি না করে চোখ বন্ধ করল চুচা। সঙ্গে সঙ্গেই কানগুলি পাহারায় খাড়া হয়ে গেল। শুনতে পেল:

— দস্যু আর দস্যুর বাচ্চা! হুররে! হুররে!

— তিন পায়ে খোঁড়াচ্ছে! হুররে!..

গাইছে বাবুইরা।

— ওখানে কী হল? — শিউরে উঠে কাঠবেড়ালী, নড়ে তার লালচে লেজটি। — কী গো, কী হল ওখানে?

আর বাবুইরা ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।

— বুড়ো শেয়াল নেকড়েছানার থাবা কামড়ে দিয়েছে। কী মজা! হুররে!

চুচা সঙ্গে সঙ্গে বাসার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। নিচের দিকে তাকিয়েই পিছু হটে গেল। কখনও সে এত উপরে উঠে নি!

নেকড়েছানার দুরবস্থার কথা শুনে কষ্ট হল চুচার।

— ও অ্যাশ-বাবুইয়ের ছানা মেরেছিল না! তার ফল পেয়েছে এবার! — চেঁচায় পাখিরা।

— সে কী, বাবুইছানা আবার কবে মারল? — জিজ্ঞেস করে কাঠবেড়ালী।

— আরে, তুই জানিস না বুঝি?

পাখিরা তাড়াহুড়ো করে সবকিছু বলতে লাগল।

চুচা পিছলে পিছলে নেমে এল পাইন গাছ থেকে। পাখিদের কথায় সে কান দিল না। পাখিরা ভীষণ বাজে বকতে পারে!

নেকড়েছানা শুয়ে রয়েছে চুচার মাঠে। সে বের করে তার সামনের ডান থাবা, আর চুচা তা চাটতে থাকে। দুটি কাটা আঙুল থেকে রক্ত ঝরছে, —থামতে চাইছে না। চুচা চেটেই চলেছে...

নেকড়েছানা ধীরে ধীরে ডাকে — কেঁউ কেঁউ। চুচা তার চিকিৎসা করে। তার দুঃখ হচ্ছে। নেকড়েছানা তার জীবন বাঁচিয়েছিল বলে চুচা তার কাছে তত কৃতজ্ঞ নয়, সে নেকড়েছানার কাছে বেশি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে আহত হয়ে বাড়ি না গিয়ে ও তার কাছে এসেছে।

— তুই এক অদ্ভুত জীব, চুচা, — নিচের ডালে ঝুলে ঝুলে বলে কাঠবেড়ালী।

— কিন্তু কেন?

— শুনেছিস, পাখিরা কী বলছে?

— আমি তা জানতাম।

— ও যে ছানাটাকে মিছিমিছি মারল!

— তবে আমার সঙ্গে ওর খুব ভাব।

— তুই সত্যি এক আজব প্রাণী, — আরও বেশি করুণ গলায় বলে কাঠবেড়ালী। — ও-রকম হয় মানুষের সমাজে, জন্তুর সমাজে নয়।

বনে যখন অন্ধকার নেমে এল, তিন পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল নেকড়েছানা।

— এবার তাহলে আসি, চুচা, — এই বলে সে তার নাকটি একটু চেটে দিল। — আমার বাপ-দাদ্যরা ঠিক-ই বলে: পরের ভাল করতে গেলে নিজেকেই শাস্তি পেতে হয়। সাচ্চা কথাই বলে তারা।
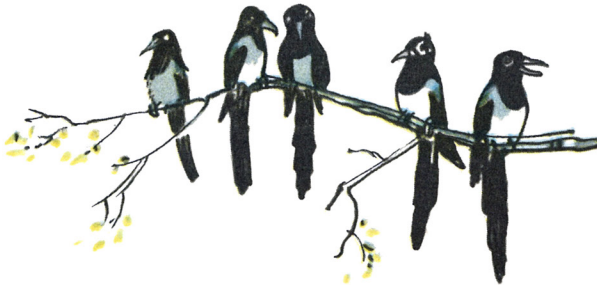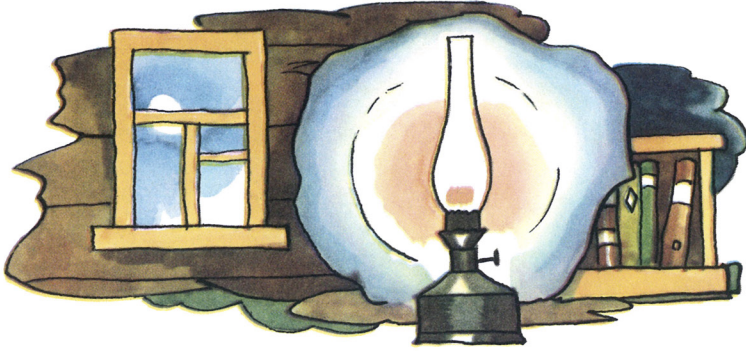
তৃতীয় অধ্যায়

জন্মভূমি

(চুচার দ্বিতীয় জীবন। পুর্নবার্তন)

— আজকের মত এই-ই যথেষ্ট, — এই বলেই ভাই নিবিয়ে দেয় টেবিল ল্যাম্পটি: এখন প্রতি সন্ধ্যায় সে বন সম্পর্কে লিখে।

বাইরে অন্ধকার। ঝড়ো হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ছে জানলার শার্শিতে — টক, টক, টক। শোনা যায় ডালপালার মড়মড় শব্দ, বাতাসের শা-শা গান।

'শা-শা-আ-আ...'

ভাই বুট-জুতো পরে দেয়ালে ঝোলানো বন্দুকের দিকে তাকাল।

— কোথায় যাচ্ছিস তুই?

— শুনছিস না?

সত্যিই তো, বৃষ্টির টক্-টক্ আর বাতাসের শা-শা শব্দের মধ্য দিয়ে দূর থেকে ভেসে আসছে জ্যান্ত আওয়াজ।

'আ-উ-উ-উ!'

এর উত্তরে শোনা গেল অতি চাপা আরও একটি ডাক:

'উ-উ-উ!'

দরজা খুলে গেল সশব্দে। দেখা গেল, বুট পায়ে বন্দুক কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে রোদে-পোড়া বনরক্ষক।

— শুনলে? — শুধাল সে।

— চল, যাওয়া যাক, — কাঁধে বন্দুক আর থলে ঝোলাতে ঝোলাতে বলে ভাই।

জানলা দিয়ে তাদের দেখাই গেল না, বাইরে ছিল ভীষণ অন্ধকার।

আমি তখন চুচার দিকে তাকালাম। ও বসে আছে পেছনের পায়ে, আর সামনের থাবা দিয়ে ধরে রেখেছে খাঁচার তারগুলি। জানলার দিকে ঝুঁকে পড়ে খাড়া করে কান।

— তুই ঘুমুচ্ছিস না, চুচা?

— নেকরে... নেকরে... মেরে ফেলবে।

— নেকড়েরা মানুষ মারবে না। মানুষের কাছে বন্দুক আছে।

— না, নেকরে... মেরে ফেলবে।

— নেকড়েকে মেরে ফেলবে? এই অন্ধকারে তা সম্ভব নয়, চুচা। তোকে তো বললাম — দেখিয়ে দেয়, কোথায় নেকড়েরা থাকে।

— মেরে ফেলবে... মেরে ফেলবে... — আমার কথা শুনল না চুচা।

হঠাৎ শোনা গেল: 'আ-উ-উ-উ!' একেবারে কাছেই।

এটা ভাইয়ের গলা, — নেকড়ের ডাক ডেকে নেকড়েকে কাছে আনার চেষ্টা করছে। পরে দূর থেকে জবাব এল, এবং আবার সাড়া দিল মানুষের গলা, তবে একেবারে জন্তুর মত কিন্তু: 'আ-উ-উ!'

চুচা ছুটোছুটি শুরু করে খাঁচার মধ্যে। কখনও আঁকড়ে ধরে তার, আর কখনও যায় সরে। 'চি-চু! চি-চু!' — ডাকে সে নিজের বুনো ভাষায়। তার ডাকে রয়েছে হতাশা।

— কী হল তোর, চুচা?

— চি-চু! — মানুষের ভাষা সে যেন ভুলে গেছে।

বাইরে আওয়াজগুলি কাছিয়ে এল। এবং তারপর হঠাৎ — গুড়ুম! গুড়ুম! গুড়ুম!

চুচা পড়ে গেল, যেন তাকে গুলি করা হয়েছে।

থপ-থপ-থপ-খর-খর-খর... — অন্ধকার বার-বারান্দা দিয়ে আসছে ওরা, টেনে আনছে ভারী কোন জিনিস। তা রয়েছে থলেতে।

— এ খ্‌কী? — বিচলিত হয় চুচা। সে মানুষের ভাষায় কথাটি বলল, ভুলেই যায় যে ঘরে ভাই রয়েছে। খাঁচা থেকে এক লাফে এসে দাঁড়ায় মেঝেতে।

— এটা কী? — আমিও জিজ্ঞেস করলাম।

— দেখ না।

থলেটা ঠেলতেই তা থেকে বেরিয়ে এল হলদে লোমে ঢাকা দু'টি পা।

— নেকড়ে!

— কী মজা, তাই না? — আনন্দিত হয় ভাই। এটা তার প্রথম নেকড়ে। আর তার চারিপাশে যে কী ঘটছে তা সে দেখলই না।

তবে আমি দেখেছি। দেখেছি, চার পায়ে হেলেদুলে চুচা কীভাবে যাওয়া-আসা করছে নিহত জন্তুটির কাছে। জন্তুর মুখের দিকে সে থলেটি টানতে থাকে খোলার চেষ্টায়। তার গোলাপী থাবাগুলো কাজ করছে দ্রুত। তবে সে নিরাশ। গায়ের লোমগুলি তার এলোমেলো, হাবভাবে দুঃখ আর দৃঢ়তার ছাপ।

ভাই আর বনরক্ষক শিকারের কথা বলছে।

— নেকড়েটি এখনও বাচ্চা, গুলি খায় নি, — জোর গলায় বলে বনরক্ষক।

— খুব বিশ্বাস করেছিল, —যোগ করে ভাই। — আমার গলা শুনেই চলে আসে।

আর চুচা এদিকে থলেটা কিছু কেটে ফেলেছে। গন্ধ শুঁকল, থাবা দিয়ে ছুঁল কান, নাক...

— আমি নেকড়ের ডাক ডাকি, লোভ দেখাই, — বলে ভাই, — ভীষণ অন্ধকার... আর এই লম্বুরাম বসে থাকে ফার বনে। বলে, 'আমি ওকে ডেকে আনব।'

চুচা চিঁচিঁ ডাকে, আরও তাড়াতাড়ি তার কাজ করে যায়। দেখা গেল সামনের বড় বাঁ থাবাটি। নেকড়েটি কী সুন্দরই না ছিল! কিন্তু চুচার কী চাই?

— আপনার ভাই ও রকম বলছে, কারণ ওর নিজেরই নেকড়ের মত ডাকতে ইচ্ছে হয়! — হাসে বনরক্ষক।

— আমি কি খারাপ ডাকি?

— অবশ্যই না। নেকড়ের বদলে অল্পের জন্যে তোকেই গুলি করি নি। চেনাই দায়!

তারা হেসে উঠল। দু'জনই ভীষণ লম্বা, দেখতে অতিকায় দৈত্যের মত। ঘরটিতে ধরছে না। উভয়ই শিকারের নেশায় মত্ত।

আর চুচা এদিকে নেকড়ের আরও একটা পা টেনে বের করে ফেলেছে। এটাও ভারি, হলদে।

এই ডান পা'টির কাছে বসে চুচা তাড়াতাড়ি হাতড়ে দেখতে লাগল নেকড়ের নখওয়ালা আঙুলগুলি — এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ... আঙুলের ডগাগুলি শক্ত।

— হঠাৎ শুনি কাছেই ঝোপঝাড়ে পটপট শব্দ। বাতাসের গতিও বদলে গেল, — আবার বলতে লাগল ভাই।

এই সময় আমাদের মাথার ওপর শুনতে পেলাম চি-চু, চি-চু ডাক। এ যেন ঠিক প্রভাতের পাখির গান, যেন হাসি, যেন মহা আনন্দের গান!

চুচা বসে আছে খাঁচার ভেতরে নয়, খাঁচার ওপরে। সে গেয়ে চলেছে একমনে! এই এক মিনিট আগেও সে কিসের ভয় করছিল? আর এখন কিসেই বা এত আনন্দ — চি-চু, চি-চু, চি-চু...

— কেমন আছিস তুই, সুন্দর শিংওয়ালা জীব? — খোঁয়াড়ের ওপরে চড়ে জিজ্ঞেস করে চুচা।

— আমার নাম তোর মনে নেই? — খেদের সঙ্গে শুধায় হরিণ।

— বড় চুচা তোকে কী বলে ডাকে সে আমি জানি।

— ও আবার কে?

— তোর মনে আছে, ও আমাকে কাঁধে বসিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল?

— আচ্ছা...

— ও-ই আমাকে তোর কাছে এনেছিল। ও তোকে আলিওশা বলে ডাকে।

— ওটা একেবারে অন্য নাম। — দুঃখের সঙ্গে মৃদু মাথা নাড়ে হরিণ।

— আমার আছে হরিণ আর শেয়াল, — বলে বন।

— আমার আছে পাখি আর বন-বেড়াল, — বলে বন।

— আ-চ-ছা! — চুচার হঠাৎ মনে পড়ল: সরু বুনো পথ, তাতে ছোট্ট খুরের দাগ, নল-খাগড়া আর জলার গন্ধ, অ্যাস্প আর পাইনের পত্রহীন চূড়া, ডালে ডালে লালচে লোম। এবং নেকড়েছানার দীর্ঘনিশ্বাস: 'হরিণেরা!' — আ-চ-ছা, — মাথা নাড়ল সে, — জানি, জানি! রাত্তিরে তুই নেকড়ের ডাক শুনেছিস?

— ও খোঁয়াড়ে এসেছিল, — জবাব দেয় হরিণ।

— ওকে মেরে ফেলেছে।

— না, মেরেছে অন্যটাকে। ল্যাংড়া এসেছিল এখানে। চলে গেছে।

— ল্যাংড়া? — অবাক হয় চুচা। — কী বলল ও তোকে?

— ও আমায় ভীষণ বকেছে। বলে, আমি নাকি নিজের মান খুইয়ে ফেলেছি, মানুষ আমাকে নিয়ে যাচ্ছেতাই করছে এবং অন্যেরা নাকি বনের গানই ভুলে গেছে।

— অন্যরা কারা?

— তা বলে নি।

— কই, আমি তো ভুলি নি! — চেঁচায় চুচা।

— ও তোর কথা বলে নি।

— আরে না, ও আমার কথাই বলেছে। ও জানে, আমি মানুষের বাড়িতে থাকি। ও জানে, আমি তোর কাছে আসি। ও সবকিছুই জানে। আমার কথাই বলেছে।

হঠাৎ শোনা গেল — হাউ-হাউ। চুচার পিলে চমকে উঠল। অল্পের জন্যে পড়ে যায় নি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে সরু-পা শিংওয়ালা বাদামী রঙের বিশাল এক জানোয়ার। ওর গোল গোল চোখগুলি মিট্‌মিট্‌ করছে। জানোয়ার শ্বাস ফেলছে: হাউ-হাউ!

— ভয় করিস না, — হরিণ হেসে ফেলে। — ওটা নীলগাই।

নীলগাইটি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে চুচার কাছে। তারপর চলে যায় তার অপর দুই সাথীর দিকে।

— তোকে এদের সঙ্গে রেখেছে কেন? — ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে চুচা।

— আমি নিজেই এসেছি এখানে। ওই ওখান থেকে লাফ দিয়ে। — মাথা নেড়ে হরিণ সেই জায়গাটি দেখিয়ে দেয় যেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ভাইবন্ধুরা।

— কিসের জন্যে?

— ওরা জন্মেছেই খোঁয়াড়ে। ওরা শুধু খেতেই জানে। বনের জীবন যে কী জিনিস ওরা জানেই না।

— আর নীলগাইয়েরা? এই রকমের শিঙ দিয়ে সহজেই কাউকে মেরে ফেলা যায়।

— ওরা কাউকে মারে না।

— এমনকি খিদে পেলেও?

— ওরা ঘাস খায়। ঘাস যে কত রকমের হয়। খেয়েছিস কখনও?

— না।

— সে কী রে, ঘাস খাস নি?

— আমি ঘাস খাই না, হরিণ।
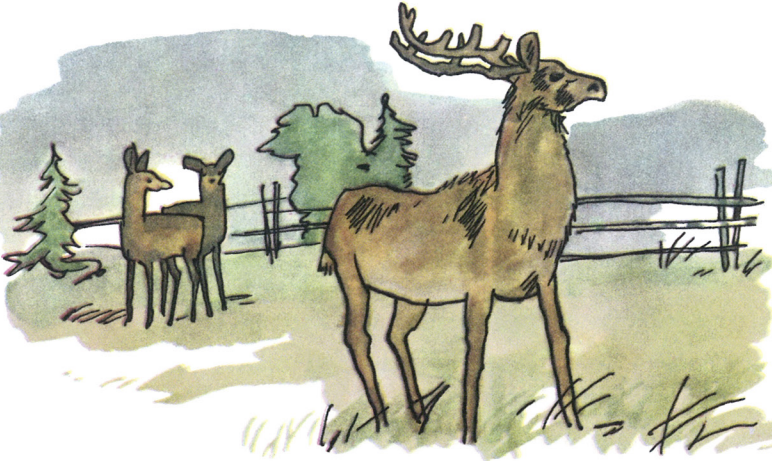
— তা তুই যদি আমার জন্য ঘাস আনতিস। না থাক, নিজেই জোগাড় করে নেব... — হরিণের চোখগুলি একেবারে বিষণ্ণ হয়ে উঠল। হঠাৎ মাথা তুলে করুণ স্বরে বলে: — আমি ছাড়া পেতে চাই! চাই স্বাধীনতা! যেতে চাই নিজের দেশে, গভীর বনে!

— উ-উ-উ! — অলস স্বরে বলে বড় নীলগাই।

— ওখানে ঝোপঝাড়! ওখানে ঘন বন! — দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হরিণ।

আর নীলগাইয়েরা নিজের কথা বলে:

— খেতে মজা নেই, খেতে স্বাদ নেই...

— ওখানে ঝোপঝাড়, ওখানে ওক-বন, ওখানে বাতাস, — গায় হরিণ।

— ওকের ডাল খেতে মজা নেই, — দুঃখ করে নীলগাইয়েরা।

— বাতাস আমার বন্ধু! — গান শেষ করে হরিণ।

আর তখন নীলগাইয়েরা নিচু গলায় বলে:

— মানুষের হাত থেকে ওকের ডাল খেতে মজা নেই।

— ওরা তাহলে বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে না কেন? — জিজ্ঞেস করে চুচা। — ওরা তা সহজেই পারে।

— ওদের বলা হয় 'খোঁয়াড়ে পোষা জন্তু', — উত্তর দেয় হরিণ। — ওরা বহু বছর আছে এখানে।

— আমি বড় চুচাকে বলব, ও তোকে ছেড়ে দেবে।

— ছাড়বে না। আমি বলেছিলাম, — মাথা নোয়ায় হরিণ।

— ও হয়তো বুঝে নি তোর কথা। তুই যে মানুষের ভাষা জানিস না।

— আর তুই জানিস?

— অবশ্যই। আমি শিখে নিয়েছি।

— আর তুই মানুষকে ভালবাসিস?

— আমি বড় চুচাকে ভালবাসি।

— তার মানে তুই মানুষকে ভালবাসিস।

— না, আমি কেবল বড় চুচাকে ভালবাসি।

— আমাদের জন্তুদের সমাজে তা হয় না, — কী যেন ভাবতে ভাবতে মাথা তুলে হরিণ। — তুই সত্যিই এক আজব জীব। ঠিক আছে, তবুও আসিস আমার কাছে। তুই বড়ই আজব, তবে খুবই বুনো।

জানলা দিয়ে উঁকি মারছে শরতের হলদে লাল বাদামী বন। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে চারিদিক। মিনিটে মিনিটে ঘন হয়ে উঠছে বাতাস। অন্ধকার ঘরে উনুনের আগুন ক্রমশই হচ্ছে উজ্জ্বল।

— আয়, খেয়ে নেয় এবার, — ডাকলাম আমি ভাইকে।

সে কাগজপত্র সরিয়ে রাখে। শুকনো লতাপাতায় ভরা অ্যালবামটির ওপর একটু হাত বুলিয়ে বন্ধ করে ফেলে। ওটা তার লতাপাতার সংগ্রহ।

— আমি শিগগিরই কাজ শেষ করব, — গর্ব করে বলে ভাই। হাত দিয়ে গাল ও চোখ রগড়ে নিয়ে বসল খেতে। ও ক্লান্ত।

তার সামনে টেবিলে রাখলাম ভাজা মাংস। গতকাল আমরা বুনো শুয়োরের মাংস পেয়েছিলাম।

— রান্না খাসা হয়েছে! — খুশি হয় ভাই। — তুই কিন্তু খুব লক্ষ্মী মেয়ে! না, তোকে এখানেই রেখে দেব! — বলতে বলতে ভুরু কোঁচকাচ্ছে। বুঝলাম, ও যা লিখছে তা নিয়েই ভাবছে। ভাবছে বনের কথা — কীভাবে তা বাড়াতে ও রক্ষা করতে হবে।

— চা দেব?

— না, পরে। — এবং আবার চলে গেল লেখার টেবিলে।

— শীত পড়ার আগে শহরে যেতে হবে, — বলল ও। — লেখা দিয়ে আসব।

— আর আমাকেও পেঁছে দিয়ে আসবি।

আমার ছুটি শেষ হয়ে আসছে।

— তোকেও নিয়ে যাব, চুচাকেও। তবে আপাতত চুপ থাক।

ঘর নিরব। বাইরে এমনকি বনও চুপ করে আছে, শুধু চুচার খাওয়ার একটু শব্দ শোনা যাচ্ছে — ওকে আমি এক টুকরো সেঁকা রুটি দিই...

খাওয়ার পর চুচাও শুয়ে সম্পূর্ণ নিরব হয়ে গেল। তার কানগুলি খাড়া। ও কী? না, কিছুই না। মনের ধান্দা। না তো, ঠিক কোন পরিচিত ডাক: 'উ-উ-উ!'

চুচা উঠে বসল। খাঁচার শিক ধরে আছে সে। আবার ডাক শোনা গেল কাছেই: 'উ-উ-উ!' একেবারে কাছেই, হরিণের খোঁয়াড় যেখানে...

— বড্ড বেহায়া দেখছি! — রেগে কাজ থেকে উঠে যায় ভাই। — ওই ল্যাংড়াটি এসেছে, ওর গলা শুনেই আমি চিনতে পারি। কালও খোঁয়াড়ে হানা দিয়েছিল। ঠিক আছে, দিন দুয়েকের মধ্যেই শিকারীরা আসবে। তখনই বেটাকে মজা দেখাব।

সকালে ভাই বেরিয়ে যেতেই চুচা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। এক লাফে টেবিলে উঠে পেছনের পায়ে বসল কাপপ্লেটের মধ্যে।

— খ্মা — মা! — প্রাণপণ চেষ্টা করে ডাকল সে। — খ্মা — মা!

— কী হয়েছে, চুচা?

— খ্হরিণের কাছে! খ্আলিওশা!

— চল, যাই।

খোঁয়াড়ে পেঁছে আমরা দেখলাম লোকের ভিড়।

— কী হয়েছে?

— চেয়ে দেখুন না।

ঠিক বেড়ার ধারে পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে... আলিওশা। পেছনের দিকে হেলানো লম্বা গলাটি শাদা।

— চি-চু! চি-চু! — চেঁচিয়ে উঠে চুচা। বিলাপ শুরু করে সে। আমার কাঁধ থেকে এক লাফে চলে গেল তার বন্ধুটির কাছে।

হরিণটিকে মেরেছে নেকড়ে। তার গায়ে নেকড়েরই থাবার দাগ।

জীবন্ত সমস্তকিছুই শোক করতে পারে। ভাঙ্গা বাসার জন্য চিৎকার ও আর্তনাদ করে পাখিরা; প্রভুর মৃত্যু হলে অনাহারে দিন যাপন করে কুকুর; বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে গেলে করুণ সুরে ঘরময় মিউ-মিউ করে বেড়াল, ছানাদের সে ডাকে...

কিন্তু জন্তুরা কীভাবে কাঁদে তা আমি আগে কখনও দেখি নি।

চুচার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর মোটা মোটা ফোঁটা। মুখটি একেবারে ভেজা। সে শুয়ে আছে আমার হাতে। কাঁদছে, কাঁপছে। আমি তার গায়ে হাত বুলাতে থাকি। কী করে সান্ত্বনা দিই বুঝে উঠতে পারলাম না।

— আমার ভাই ওই ল্যাংড়া নেকড়েটিকে খতম করবে, — বললাম আমি। — ও-ই আলিওশাকে মেরেছে।

— খু্না-না... আমি... আমি! — জোর গলায় বলে চুচা।

সে হয়তো নিজেই এখন অনুতপ্ত যে আগে মানুষকে দেখিয়ে দেয় নি নেকড়ের বাসস্থান। তাই এখন মারা পড়ল তারই বন্ধু।

পরের দিন পড়ল শীতের প্রথম বরফ। তার শুভ্রতায় গোটা বন্য জীবনের ছাপ: এখান দিয়ে ছুটে গেছে খরগোশ — পড়ে রয়েছে পেছনের লম্বা পায়ের দাগ; এই তো পাখিদের নখের চিহ্ন — বার্চের বীজ খেতে নেমেছিল...

— আজই ল্যাংড়াটাকে শেষ করব, — বলল ভাই।

এবং আবার বনে গুলির আওয়াজ।

প্রতিবার চুচা কেঁপে উঠে, সঙ্কুচিত হয়ে বসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে।

মনে পড়ে তার লাল বিলবেরি, সুরভিত ফারবন, সবুজ ওক বীথি... কিন্তু এই শীত আর বরফের সময় ওখানে কী আছে তা সে জানত না।

অ্যাশ-বাবুইয়ের কথাও তার হামেশা মনে পড়ে। সে জানত যে পাখিরা তাদের কথা রাখে। বনে মানুষ এলে তারা সে খবর ছড়িয়ে দেয় সারা বনে।

খাওয়াদাওয়ায় চুচার আর রুচি নেই, চোখে নেই ঘুম, মুখে নেই কথা। জানলার ধারে বসে থাকে কার অপেক্ষায়। কিন্তু সে এমনকি দেখতেও পেল না কীভাবে শিকারীরা এল।

অন্ধকার রাত। শিকারীদের দেখল না, কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পেল সে। তা থেকেই ধরে নেয় — কাঁধে করে তারা কোনকিছু আনছে কিনা। না, কিছুই আনছে না!

বাইরে অসংখ্য পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল। শুধু একজন কে যেন বুট-পায়ে ঘরে এসে ঢুকছে। বার-বারান্দায় পায়ের শব্দ।

ভাই তার ভেজা টুপিটি ছুঁড়ে ফেলে চেয়ারে।

— কী রে, ল্যাংড়া পালিয়েছে? — আমি জিজ্ঞেস করলাম। তবে তার মুখ দেখেই বোঝা গেল — কাজ হাসিল হয় নি।

— আর একটু হলে পালিয়ে যেত! — হঠাৎ হেসে উঠল ভাই। — লাল নিশান দিয়ে ঘিরে রেখেছি! পালাবে না! — সে চেয়ারটি টেনে বসল টেবিলের কাছে। টেবিলে গরম চা। গ্লাসের গায়ে হাত গরম করতে করতে কয়েক ঢোক চা খেয়ে বলল: — নেকড়েটা আমাদের অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল।

ভীষণ নেতিয়ে পড়েছে! ঠাণ্ডাও লেগেছে খুব! বেচারা বনরক্ষক!

— উনুনের কাছে বস্।

— আঃ, কী আরাম!

— তারপর ল্যাংড়ার কী হল?

— বলছি তো অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল। সবকিছু বিলকুল গুলিয়ে দিয়েছিল। পাখিরা না হলে চলেই যেত। ওকে দেখেই চেঁচামেচি শুরু করল। নেকড়ের পেছন পেছন ছুটে পাখিরা, আর পাখিদের পেছন পেছন — আমরা। পথ হারালে পাখিরা পথ দেখিয়ে দেয়। অন্ধকার না হলে আজই বেটাকে ধরে ফেলতুম। ওখানে জলা জায়গা। তাই ভয় হল। তবে এবার আর পালাতে পারবে না!

ভেজা কাপড়চোপড় ছেড়ে ভাই শুতে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। হয়তো স্বপ্নও

দেখেছে: শাদা বরফ, পায়ের কাল চিহ্ন — তিনটি থাবা স্বাভাবিক, আর একটিতে কেবল তিনটি আঙুল। ল্যাংড়া নেকড়ে কিনা। আর ওপরে — পাখিরা। আমি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি। এমন সময় হাতে পরিচিত সুড়সুড়ি টের পেলাম। উষ্ণ নরম মুখটি। নাকটি ভেজা।

— যা, এবার ঘুমো তো, চুচা। আমাকে ভোরে উঠতে হবে।

— খ্কোথায়-ও? খ্কোথায়-ও? — কানে কানে জিজ্ঞেস করে চুচা।

— কে?

— খ্নেকড়ে...

— ওকে ধরে ফেলেছে। আর যেতে পারবে না।

— খ্ফাঁদ? — বহু কষ্টে উচ্চারণ করে চুচা।

— না, ফাঁদ নয়। নেকড়ে শিকার করা হয় লাল নিশান দিয়ে। এই সাধারণ ন্যাকড়া আর কি। যেখানে নেকড়ে থাকে সে জায়গাটি লাল নিশান বাঁধা দড়ি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। নেকড়ে ওটা টপকে যেতে ভয় পায়।

— খ্কিসের ভয় পায়?

— কে জানে। ভয়ের কিছুই নেই। নিশান তো আর বন্দুকের মত গুলিও ছুঁড়ে না কিংবা ফাঁদের মত ধরেও ফেলে না। বুঝলি? তবে নেকড়েরা তা জানে না। তাই এবার ল্যাংড়া ফাঁদে পড়েছে। নিশ্চিন্তে ঘুমো এবার। ও আর কাউকে মারতে পারবে না।

চুচা যায় না। এমনকি সরেও না। আমার কানের কাছে চুপটি মেরে বসে থাকল। যেন কোনকিছু ভাবছে। তারপর উঠে আমার গাল আর নাক চেটে দিল। তন্দ্রার মধ্যে শুনতে পেলাম চুচা কখনও ঘুরাঘুরি করছে খাঁচায়, কখনও — জানলার ধারে।

ঘুম ভাঙল দেরিতে। টেরই পাই নি কখন ভাই বেরিয়ে গেছে। উঠে দেখি সে ফিরে এসেছে। রাগের সঙ্গে ধড়াম করে বন্ধ করল দরজা। বাইরে তখনও অপরিষ্কার। তখনও সকাল।

— এত তাড়াতাড়ি চলে এলি যে?

— আর পারি না, মরুক গে! — চেঁচিয়ে উঠে ভাই। — যেন ভূত একটা, নেকড়ে নয়। ঠিক জানি — ওখানে রয়েছে, নিশানার গণ্ডি ছেড়ে যেতে পারবে না। কিন্তু পালিয়েছে। বুড়ো কোন নেকড়ের অমন সাহসই হত না। আর ওটা একেবারে বাচ্চা কিনা।

আমার শিকারীর চেহারা দেখে আমার দুঃখই হল। কিন্তু তার শোচনীয় অবস্থা আমি যাতে টের না পাই সেজন্য সে বেরিয়ে পড়ল। আঙ্গিনা থেকে চেলা কাটার শব্দ এল কানে।

— আমি তোকে মিছেই কথা দিয়েছিলাম, চুচা... — খাঁচার ভেতরে তাকালাম। সে কী? খাঁচা যে খালি।

টেবিলে, বইয়ের তাকে, বিছানায় কোথাও নেই চুচা। জানলায়ও। তবে বাইরে গলন্ত বরফের ওপর ছোট ছোট পায়ের ছাপ। কোন একটি খুদে চতুষ্পদ প্রাণী ছুটে গেছে বনের দিকে।

ভাই চেলা এনে ফেলল উনুনের কাছে। কাঁধ থেকে কাঠের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলল।

— কী রে, চুচার কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? — বলে সে। — অসুখ-বিসুখ করে নি তো?

আমি নিরব থাকলাম। যে বিষয়ে নিরব থাকলাম তা হল এই:

আমাদের ঘরে বাস করে আমাদের অবোধ্য বিশাল বনের ছোট্ট একটি প্রাণী। সে আমাদের ভালবেসে ফেলে — যেভাবে লোকে ভালবাসতে পারে অপরের দেশ।

কিন্তু আসে দিন, যখন তারা পুরনো বন্ধুবান্ধব ছেড়ে চলে যায় আপন আপন দেশে, এবং তখন তাদের নিয়মই তাদের কাছে হয় সবচেয়ে প্রিয়। তাজা জখমেরই মত তখন ব্যথা পায় পুরনো বন্ধুত্ব।

কিন্তু আপন দেশে ফিরে যাওয়ার জন্যে অপরের সঙ্গে ভাঙ্গতে হয় বন্ধন।

চুচাও সব বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছে।

আমারও চলে যাওয়ার দিন ঘনিয়ে এল।

বনকে বিদায় জানাতে বেরলাম। ভোরের বরফ গেছে গলে। রোদ নেই। সিক্ত নিস্তব্ধ বন। অপেক্ষা করছে বাতাস আর শীতের তাজা তুষারের।

বিলবেরি ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সবুজ শৈবাল। পায়ে-চলা পথের ধারে ঝিমুচ্ছে লম্বা লম্বা হলদে ঘাস... এই তো সামনেই রয়েছে শিকড়-শুদ্ধ উপড়ে পড়া পরিচিত ফারগাছটি। আর দূরে — গভীর বন।

আমি কোন রকমে চিনতে পারলাম এই জায়গাগুলি। আর জায়গাগুলিরও খুব একটা মনে নেই আমার কথা...

হঠাৎ পায়ের কাছে এসে পড়ল ফারের বিরাট এক মোচা। আমি ওটা তুলে নিলাম। ওপরে গাছের ডালে কী যেন শব্দ করে থেমে গেল। কাঠবেড়ালী?

আর হয়তো বা...

আমি হাত পাতলাম ওপরের দিকে।

— আয় আমার কাছে!

কিন্তু কেউ এল না।

আমি এগিয়ে গেলাম। গহন বনে প্রবেশের মুখে — যেখানে শেষ হয়েছে পায়ে-চলা পথ — পড়ে ছিল হলদে-বাদামী পাঁচটি চমৎকার বাদাম। তাকালাম চারিদিকে: কাছে কোথাও কোন আখরোট-ঝাড় নেই। আমি আবার ভাবলাম: যদি হঠাৎ! এবং ডাকলাম:

— চুচা!

ফারের ডালে ডালে আবার কিসের শব্দ। দূর থেকে ভেসে এল প্রতিধ্বনি: 'চু-চা! চু-চা!'

প্রতিধ্বনি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল হাওয়ায়, মিশে গেল পত্রের মর্মরে, পাখির কলকাকলি আর বনের গানের সঙ্গে। পত্রমর্মর, পাখির কলকাকলি, বনের গান — সবকিছু মিলে একাকার হয়ে গেছে।

এবং হঠাৎ তার মধ্যেও শুনতে পেলাম বনের গান:

আমি বাতাস, আমি ডাল, বাঁচব চিরদিন,
আমি সবুজ, আমি পূর্ণ, আমি স্বাধীন।
আমার আছে পাইন আর ওক গাছ,
আছে জল আর মাছ।
আমার পুকুরে আছে রুই-কাতলার পোনা,
তীরে এসে জল খায় হরিণের ছানা...

আমার পকেটে ফারের মোচার খসখস শব্দ; উষ্ণ আঙুল অনুভব করছে আখরোটের মসৃণতা; আমার মধ্যে, আমার মাথার ওপরে এবং আমার চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে বৃহৎ বনের গান। এ হচ্ছে চুচার উপহার...

আমি তা সযত্নে রাখব।

আমি তা চিরকাল সযত্নে রক্ষা করব।

1
বকপুর গ্রাম,
বাড়ি নং ১
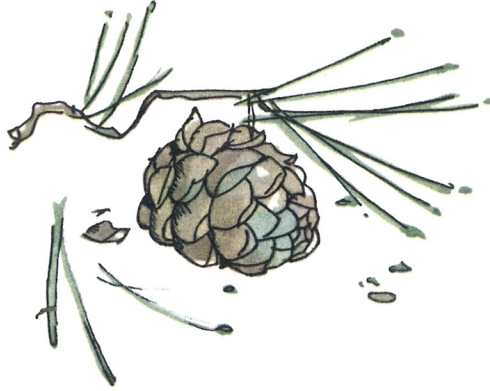
প্রথম অধ্যায়

দিদিমা

আলিওনার দিদিমা হামেশাই নিরব থাকেন। আলিওনা তাঁকে বলে:

— সুপ্রভাত দিদিমা!

আর দিদিমা:

— আরও একটু ঘুমো।

নিজে কিন্তু এদিকে উনুন ধরান, ভাত রাঁধেন, গানও গান:

হায়, শুরা শুরা শুরা,
খেলি আমার মাথা,
আর দাঁড়ি হল শাদা!

একটি হাঁড়ি উনুনে বসাতে-না-বসাতেই তুলে নেন আরেকটি হাঁড়ি:

হায়, শুরা শুরা শুরা!

শুনলে মনে হয় যেন এই হাঁড়িটির নামই শুরা। আলিওনা দেখে, চুপি চুপি হাসে। দিদিমার সঙ্গে গল্প করার ভীষণ ইচ্ছা তার।

— দিদিমা, গোরু পালে ছেড়েছ?

— ছেড়েছি।

ব্যস, আর চুপ।

অ্যাপ্রনের পকেটে ভরলেন দানা, ভেঙ্গে গুঁড়ো করলেন শুকনো রুটি, গেলেন উঠোনে:

— আয় আয় আয়!

দিদিমার মুরগিছানারা এর মধ্যেই বেশ বেড়ে গেছে, পাগুলি তাদের লম্বা লম্বা, দৌড়ায়, ধাক্কাধাক্কি করে। অসম্ভব দুষ্টুমি করতে পারে। একেবারে দস্যু আর কি। আলিওনার মা'র মুরগিছানাগুলি এখনও ছোট ছোট, হলদে রঙের, আর মুরগিরা — ফুটকিদার।

— দিদিমা, মনে আছে তুমি আমায় বলেছিলে ডাকাতের গল্প বলবে?

— ঠিক আছে বলব। তবে আগে কাজগুলো সেরে নিই।

— তোমার এখানে আমার দু'দিন হয়ে গেল, আর তোমার কাজ শেষই হচ্ছে না।

— হবে রে হবে।

পুরনো দস্তানা আর ছুরি নিয়ে দিদিমা গেলেন সবজি ভুঁইয়ে। কিছু বিছুটি কেটে নেন। আলিওনা আবার তাঁর পেছন পেছন।

— দিদিমা, এগুলি কি শুয়োরছানার জন্য?

— তাই।

— আচ্ছা দিদিমা!

— কিরে, তোর কী চাই?

আলিওনা নিজেই জানে না আর কী জিজ্ঞেস করবে।

— আচ্ছা দিদিমা, তুমি লোটো খেলতে জান?

— তুই আমায় জ্বালিয়ে মারলি!

— আর তাস?

আচ্ছা, তুই এবার যা তো আলিওনা. পাশের বাড়ির তানিয়ার সঙ্গে একটু খেলে আয়, — নিঃশ্বাস ফেলেন দিদিমা। — দেখবি, ও কিন্তু বড় ভাল মেয়ে। তখন আর আমার পেছন পেছন ঘুরবি না।

আলিওনা যেন তাঁর পেছনই ছাড়ে না আর কি। সে মোটেই তাঁর পেছন পেছন ঘুরে না। কেবল তার করার কিছু নেই। আর তিনদিন ধরে তানিয়াকে দেখে দেখেও তার সাধ মিটে গেছে। তানিয়া মেয়েটি ভীষণ ঝগড়াটে। আলিওনা তাকে কিছুই বলে না, কিন্তু তানিয়া দেউড়িতে বেরিয়েই উপরের ঠোঁটে টেনে আনে বেণীর একটা ডগা। যেন তার ও-রকম গোঁফ আছে। আলিওনাকে ভয় দেখায়।

দিদিমার সঙ্গে আলিওনা যখন বিছুটি কাটে, তানিয়াও বেরোয় তার নিজের সবজি ভুঁইয়ে। বেড়ার ও-পাশে ঘুরাঘুরি করে সে। উপড়ে তুলে মোটা একটি গাজর। তারপর বলে:

— কিরে দিদিমার ল্যাজ, কেমন আছিস?

আলিওনার মুখচোখ লাল, রাগ করে সে। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। আর তানিয়া গাজরটি মাথার উপর তুলে তার সঙ্গে কথা বলে। আলিওনার সঙ্গে নয়, গাজরের সঙ্গে:

— কেমন আছিস? তুই মিষ্টি? তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলব না সেদ্ধ করব? ঠিক আছে, চল দিদিমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, — এবং ছুটে চলে যায়।

তানিয়ারও দিদিমা আছে। তাই খুঁত ধরার উপায় নেই। কিন্তু আলিওনার মনে তো লাগল।

কাঁচা খাবে না সেদ্ধ করবে — সে আবার কী কথা? ইচ্ছে করেই ও তা বলছে, তাকে চটাবার জন্যে। তানিয়া আলিওনার চেয়ে কিছুটা বড়। ও ঝগড়া করতে ভীষণ ভালবাসে।

দেখা যাচ্ছে দিদিমা এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। খুললেন মাথার রুমাল। মুখটি মুছে নিলেন।

— চল্ আলিওনা, এবার গিয়ে ঘরটা একটু সাফসোফাই করি, কী বলিস?

— হ্যাঁ, চল, — খুশি হয় আলিওনা। যাক শেষে একটি কাজ মিলল।

ঘরে গিয়ে দিদিমা তাকে দিলেন একটা ঝাঁটা:

— ঝাড়ু দিতে জানিস?

— বাঃ, কী যে বল?

দিদিমা বসে গেলেন বিছুটি কাটতে। তারপর তা দিয়ে খাবার তৈরি করলেন শুয়োরছানার জন্যে। আর আলিওনা ততক্ষণে পটাপট পুরো ঘরটা পরিষ্কার করে ফেলল। ন্যাকড়া দিয়ে মুছল টেবিলটি।

— তুই যে দেখছি একেবারে পাকা গিন্নি! — অবাক হন দিদিমা। — আর আমি ভাবছিলাম, তুই এখনও ছোট, কিছুই জানিস না।

— শুধু কি তাই? বাড়িতে আমি আলু পরিষ্কার করি, বাগান থেকে পেঁয়াজ তুলে আনি। আমি সবকিছুই পারি, দিদিমা। মা'র যে সময় নেই। আর তোমার সময় আছে, দিদিমা?

— আমার হামেশাই কাজ। আমি যে একেবারে একা।

— তাই তো, দিদিমা, তুমি একদম চুপচাপ থাক।

— অ্যাঁ?

— বলছি, একা বলেই তুমি এত চুপচাপ থাক।

— সত্যিই চুপচাপ থাকি? — আলিওনাকে জড়িয়ে ধরে হাসেন দিদিমা। — চল্, এবার পরিজ খাওয়া যাক।

— আচ্ছা দিদিমা, বাবা কবে আসবেন আমায় নিয়ে যেতে?

— বাড়ির জন্য মন টানছে বুঝি?

— না গো না, এমনিতেই বলছি।

— জানিস আলিওনা, শিগগিরই তোর ভাই বা বোন হবে। তখনই তোর ঝামেলা বাড়বে।

— বাড়ুক গে। এমনিতেই পুতুল নিয়ে আমার ঝামেলা কি আর কম?

পরিজ খেল আলিওনা। খাসা পরিজ রাঁধেন দিদিমা! তারপর বেরিয়ে গেল দেউড়িতে। গ্রামটি ছোট, খুবই অল্প কয়েকটি বাড়ি। গ্রামের নামটিও আজব — বকপুর? বকপুর আবার কী? কেন এমন নাম? সব্জি বাগানগুলি শেষ হতেই শুরু হয় বন। আলিওনা এখনও যায় নি বনে। একেবারে ভূঁইয়ের ধারে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটি ফারগাছ। আর বাকিগুলো একটু দূরে, যেন কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে। ওগুলোও কিন্তু ছোট।

— এবার তাহলে গাই দোয়াতে যাওয়া যাক, কী বলিস? — জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

— চল যাই। আগে তুমি আমায় সঙ্গে নাও নি কেন?

— থকে যাবি এই ভয়ে।

— তুমি আমায় ছোট্ট ভেবেছিলে, তাই না দিদিমা?

— হ্যাঁ তাই।

সবজি ভূঁইয়ের পাশ দিয়ে তারা দু'জনে যায় বনে। বনে পায়ে-চলা সরু পথ। আলিওনা যেতে যেতে হঠাৎ দেখে: বেঙের একটি ছাতা। ছাতাটি খুব বড় ও লাল। হলদেটে পাতার একটু আড়ালে ওটা।

— দিদিমা দ্যাখো, দ্যাখো! — বেঙের ছাতাটি সে উপড়ে তুলে।

— বয়স কম কিনা, তাই সবকিছু সহজে দেখতে পাস! — বিস্মিত হন দিদিমা। — বেঙের ছাতাটি কিন্তু সুন্দর!

— ওই যে আরও একটি!.. আরও অনেক!..

— এই বেঙের ছাতাগুলি ভাল, — বলেন দিদিমা। — এগুলোকে বলে লাল-ছাতা। রঙ লাল বলেই এই নাম। আর অ্যাস্পগাছের নিচে যেগুলি গজায় সেগুলিকে বলে অ্যাস্প-ছাতা। রাখবি-টা কোথায়?

সত্যিই রাখার জন্য থলে-টলে কিছুই নেই।

— ঠিক আছে, ফারগাছটির তলায় রেখে দে, — বলেন দিদিমা। — ওই যে দেখছিস না তোর সমান উঁচু ও সুন্দর ফারগাছটি। রেখে দে, কেউ নেবে না। এখানে সবাই নিজের লোক।

— সে কী করে হয়?
— তাই হয়। এখানে সবার সমান পদবী।
— কী পদবী?
— বকপুরী।
— আর আমি?
— তুইও।
বেশ তো। আলিওনা তা জানতই না।
— কিন্তু কেন, দিদিমা?
— সে অনেক কথা। পরে বলব, কেমন?

* * *

দিদিমার গরুটি শাদা। গায়ে তার কালো ফুটফুট দাগ। দেখতে একদম বিশ্রী! মুখটি চওড়া, শিং ভাঙ্গা, ঠিক চোখের উপরেও কালো একটি দাগ।

আলিওনার মা'র গরুটি লালচে। দেখতেও সুন্দর।

যখন চলে, মনে হয় যেন ভাসছে। আর এটি কেবল লাফালাফি করে ও আড় চোখে দেখে।

— আচ্ছা দিদিমা, তোমাদের গোরুগুলির পদবীও বকপুরী?

— হয়েছে, বাজে কথা রাখ তো!

দিদিমা তাঁর গাইটিকে ভালবাসেন। দুধ দোয়ার সময় আদর করে কথা বলেন তার সঙ্গে।

— তুই আমার সুন্দরী, — বলেন দিদিমা। — না খেয়ে খেয়ে কী শুকিয়েছিস!.. এই দাঁড়া বলছি! দাঁড়া পাগলী!

আর সুন্দরী এদিকে পা দিয়ে মাছি তাড়ায়, এছাড়া সে আর কিছু জানে না। সব গরুই মাছি তাড়ায় লেজ দিয়ে, আর সুন্দরী — পা দিয়ে।

— দাঁড়া, চুপ করে দাঁড়া! — বলেন দিদিমা। — আমি তোকে গান গেয়ে শোনাব। — এবং ছোট্ট একটি গান ধরলেন গরুর জন্যে:

ও আমার সুন্দরী শাদা সই,
বল্ না তোর মনের কথা, —
আমি কান পেতে রই!

আর গাইটি কান খাড়া করে শুনে। কিন্তু মনের কথা বলে না কিছুতেই। আজব গরু রে বাবা!

— তোদের গ্রামের খামারে আমাদের গাইগুলি দিয়ে আসতে চাই, — বলেন দিদিমা।— আর খামার আমাদের জন্যে দুধ পাঠাবে। তোর বাবাই ট্রাকে করে দুধ দিয়ে যাবে।

— তাহলে দিয়েই এসো না! — বুদ্ধি দেয় আলিওনা।

— 'দিয়েই এসো না' বললেই হল আর কি! — মাথা নাড়েন দিদিমা। — আমার যাদুমণিটিকে ছেড়ে কীভাবে থাকব বল?

‘হা-ম্-বা...’ — বলে যাদুমণি এবং মারে এক চাট। ভাগ্যিস বালতিটি দিদিমা সরিয়ে রেখে ছিলেন, তা না হলে সব দুধ পড়ত মাটিতে।

— দিদিমা, তোমার গোরু-বাছুরগুলি বড্ড বজ্জাত। কি মুরগি কি গোরু সবই সমান।

— তুই আমার শুয়োরছানাটিকে এখনও দেখিস নি! — সগর্বে বলেন দিদিমা। — ভীষণ দুষ্টু!

— আচ্ছা দিদিমা, শুয়োরছানাও তোমার যাদুমণি?

— ঢের হয়েছে, চল তো দেখি এবার...

বনের ভেতর দিয়ে যায় তারা। আলিওনা দুধের বালতিটি একটু ধরে রেখেছে।

এই তো সেই সুন্দর ফারগাছটি। তারই নিচে বেঙের ছাতা। সত্যিই তো, কেউ তা নিয়ে যায় নি।

আলিওনা আঁচলে রাখল বেঙের ছাতাগুলি।

— দিদিমা, এবার বলো।

— কী বলব?

— গল্প।

— ডাকাতের গল্প?

— না, বকপুরীদের।

— ওটা যে গল্প নয়, সোনা আমার। আমাদের গ্রাম নিয়ে বুড়োবুড়িরা তা-ই বলে। আমি যখন তোর মত ছোট ছিলাম তখনই শুনেছি...
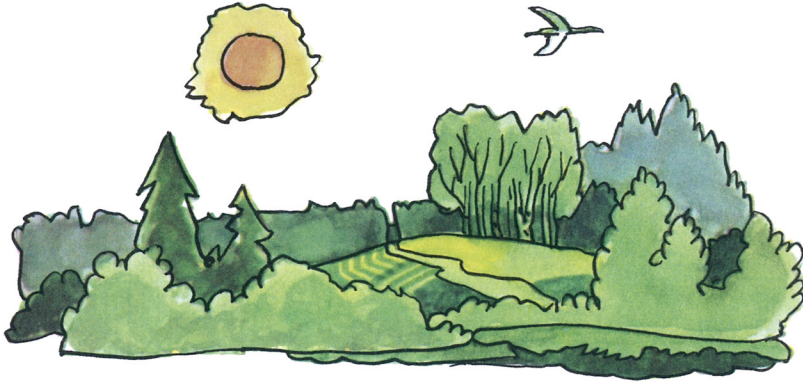
দ্বিতীয় অধ্যায়

শাদা বক

কোন এক গ্রামে — যেমন, ধর তোদের মারিনো গ্রামে — থাকত দুই ভাই। ছোট ভাই ভাল গান গায়, গল্প বলে। আর বড় ভাই হামেশাই সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ও বেচা-কেনা ভাল জানে। একেবারে ব্যাপারি আর কি।

একদিন সে ছোট ভাইকে বলে:

'শোন্, চল বাজারে গিয়ে তোর ঘোড়াটি বেচে আসি। এমনিতেই তোর দ্বারা আর সংসার করা হবে না। বেচে টাকা আধা-আধি ভাগ করে নেব। এক বছর তোকে খাওয়াব-ও।'

ব্যস, ছোট ভাই তো রাজী।

বুনো এক পথ দিয়ে চলল তারা বাজারে।

— এই পথ দিয়ে? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— হয়তো এই পথ দিয়েই। তুই কথা বলিস না তো। মাঝখানে কথা বললে গল্পের মজা চলে যায়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম... চলল তারা বাজারে। ছোট ভাই যাচ্ছে আগে আগে। হঠাৎ সে শুনে ঘোড়া যেন তাকে বলছে:

'মালিক, পরের কাছে, মন্দ লোকের কাছে আমায় তুমি বেচো না। আমি তোমার সেবা করব, তোমায় এক অপরূপ ব্যাপার দেখাব।'

'কী সে অপরূপ ব্যাপার?'

'এসো, দেখাই তাহলে। মোড় ফিরে চল।'

মোড় ফিরে চলল ছোট ভাই। চেয়ে দেখে — চারিদিকে বন আর জলা। আর জলার একেবারে মধ্যিখানে কী সুন্দর এক বাগান। দেখলে চমক লাগে: বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুধের মত শাদা এক বক। কখনও খায় আপেল, কখনও — চেরি।

এই অপরূপ ঘটনা কাউকে বললে বিশ্বাসই করবে না।

ছোট ভাই ঘোড়া থামিয়ে বলে:

'দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কোথাও আর যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না।'

আর বড় ভাই উত্তর দেয়:

'আর আমার ইচ্ছে বাগানটি সওদাগরদের কাছে বেচে দিই। বেশ মোটা টাকা পাওয়া যাবে। এবার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেললেই আমাদের হয়ে যাবে। চল তো কাছে গিয়ে দেখি।'

শাদা বক তাদের দেখে ফেলল। করুণ গলায় ডেকে উঠল, যেন কাঁদছে। ঠেং দিয়ে সে পটাপট গালিচার মত গুটিয়ে নিল পুরো বাগানটি।

তক্ষুণি ছুটে গেল বড় ভাইটি। ধরল পাখিটিকে। আর পাখিটি ডানা দিয়ে ঝাপটা মেরে উড়ে চলে গেল। বড় ভাই গুটানো জিনিসটির একটি প্রান্তই কেবল ধরতে পেরেছিল। ফলে ছোট্ট একটি টুকরো তার হাতে থেকে গেল। মাটিতে এসে পড়ল আপেল, নাশপাতি আর চেরি... আর তখন থেকেই আমাদের বনে গজাতে লাগল ঝোপঝাড়, গাছপালা...

ভাইদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হল:

'তুই কেন ওকে ধরতে গেলি?'

'চুপ কর, আহাম্মক! আমি কম-সে-কম একটা টুকরো তো ভাঙ্গতে পেরেছি। ইচ্ছে করলে তুইও পারতি।'

'আমার ওতে দরকারই নেই,' — বলে ছোট ভাই।

তারা বাড়ি ফিরে এল।

বড় ভাই ছুটে গেল দেউড়িতে। ভেঙ্গে আনা জিনিসটি দেখল ভাল করে। দেখে, এটা মামুলি এক পাপোশ! আমাদের দেশের গাঁয়ের মেয়েরা ন্যাকড়া দিয়েই পাপোশ বুনতে পারে।

বড় ভাই তো রেগে আগুন। যাক, পরে পাপোশটি সে বেচে দিল কোন এক সওদাগরের কাছে।

আর ছোট ভাইয়ের মনে শান্তি নেই। তার যেন কিসের কমতি আছে। বার বার যায় সেই জলার ধারে। শাদা বকের অপেক্ষা করে। বহুদিন বকের দেখা নেই। তবে এক রাতে (সেদিন ছোট ভাইটি রাত কাটায় ওখানে ধুনির কাছে) বক সত্যিই ফিরল।

'আমি বক নই, — বলে সে, — আমি যাদু-করা এক মেয়ে। মানে রাজকন্যা। দুষ্ট ডাইন আমায় বাগান পাহারার কাজে লাগিয়েছে। বলে, 'পাহারা দিতে থাক, এখানেই তুই ভাল মানুষের দেখা পাবি। ভাল মানুষটি বাগানের পাশেই বাড়ি করে তোকে তার কাছে নিয়ে যাবে। তখন আর যাদুর শক্তি থাকবে না, এবং আবার তুই হয়ে উঠবি মেয়ে।' তুই তো দেখতেই পাচ্ছিস, আমি পাহারা দিই নি।'

'আমি ওই পাপোশটি খুঁজে নিয়ে আসব,' — কথা দেয় ছোট ভাই।

'কিন্তু ভাল মানুষ পাব কোথায়?' — জিজ্ঞেস করে বক।

'আমিই খারাপ কি? কিংবা তোর পছন্দ হচ্ছে না?'

তারপর কী হল জানিস?

বকের সুখের খোঁজে ছোট ভাই সারা দুনিয়া ঘুরল।

— পেল, দিদিমা?

— কোথায় আর পায়? পাপোশ আছে ঘরে ঘরে। ফিরল বেচারা খালি হাতে।

— ও মা সে কী?

— ব্যস, করার কিছু নেই। হ্যাঁ, তুই বার বার জিজ্ঞেস করিস না, আমি নিজেই সবকিছু বলব।

জলার পারে ওই পড়ে-থাকা নাশপাতি আর চেরির কাছে ঘর করল ছোট ভাই।

— আর বকও মেয়ে হয়ে গেল, তাই না?

— কোথায়! বাগান যে পাহারা দেয় নি। তবে ভাল মানুষ সে খুঁজে পেল। তাই ডাইন তাকে বছরে একটি সপ্তাহ উপহার দিত — তখন বক ঘুরে বেড়াত মানুষের বেশে। তবে পাখি পাখিই থেকে গেল।

বুড়োবুড়িরা বলে, তখন থেকেই আমাদের জলাগুলিতে শাদা বক দেখা যায়। যে-ই যায়, সে-ই দেখতে পায়। সব্বার মুখে কেবল একই কথা:

'বক, বক, বক...'

ওই থেকেই আমাদের গাঁয়ের নাম বকপুর। আর লোকেদের পদবী হল বকপুরী। ব্যস, গল্পও শেষ।

— দিদিমা, — হেসে উঠে আলিওনা, — তুমি কিন্তু মোটেই মুখ-বোজা নও! এবার আমি তোমায় সব কাজে সাহায্য করব, কেমন দিদিমা?
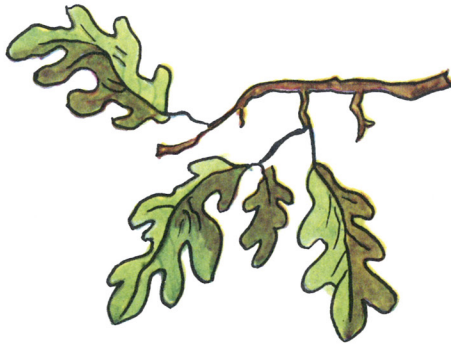
তৃতীয় অধ্যায়

তানিয়া

তানিয়া মেয়েটি নিজেই এল বিকেলের দিকে। এসে বলে:

— একা-একা তোর খারাপ লাগছে না? চল আমার বাড়িতে, পুতুল নিয়ে খেলা যাক।

আলিওনা গেল তানিয়ার সঙ্গে।

তানিয়ার তিনটি পুতুল। একটি একেবারে নতুন, জামা গায়ে। অপরটি ন্যাংটা। আর তিন নম্বর পুতুলটি ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি। ওটা সম্পূর্ণ নোংরা। নাকে-গালে ময়লা লেগে আছে। জামাও পুরনো।

— এই দু'টি হবে আমার মেয়ে, — বলেই তানিয়া তুলে নিল দু'টি পুতুল — ন্যাকড়ার পুতুল আর জামা পরা নতুন পুতুলটি।

আলিওনা পেল ন্যাংটা পুতুল।

— কী নাম এর? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— জানি না। তবে বোরকা বলে ডাকতে পারিস, — জবাব দেয় তানিয়া। — চল এবার আমাদের বাচ্চাদের নিয়ে হাওয়া খেতে যাই।

আলিওনা তার মাথার স্কার্ফটি খুলে বোরকাকে মুড়ে নিল। কখনও স্কার্ফের এককোণ দিয়ে সে রোদে ঢেকে রাখে বোরকার মুখ, আর কখনও খুলে দেয় যাতে বোরকা চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পারে। গানও গায়:

ঘুমায় আমার লক্ষ্মী খোকন,
জাগবে না সে অনেকখন...

আর তানিয়া তাকিয়ে দেখতে দেখতে বলে:

— মিছেই আমি বোরকাকে তোর হাতে দিলাম।

পরে আরও বলে:

— আমার আদুরে মেয়েটির নাম — এলভিরা, আর এই নোংরাটির নাম — দাশা।

— তুই ওকে ভালবাসিস?

— একদম না!

— সে কী! — অবাক হয় আলিওনা। — তা কী করে হয়?

— ও আমায় জ্বালিয়ে মারল। আমি ওকে জঙ্গলে ফেলে আসব। — এবং দাশাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাড়ির কাছের ঝোপঝাড়ের মধ্যে। — নেকড়েরা এবার খাক ওকে।

আর দাশা গিয়ে পড়েছে ঘাসের উপর এবং হয়তো কাঁদছে।

তানিয়া ও আলিওনা চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে দেউড়ির কাছে।

— তুই হয়তো ওকে বেশি লাই দিয়েছিলি। — বলে আলিওনা।

— মোটেই না। ও অসম্ভব নোংরা থাকে এই যা।

— হয়তো তোর সঙ্গে রাগারাগি করত?

— না, তাও করত না।

— মনে হয় তোকে কখনও কাজে মদত করত না?

— না, তা করত, — বলে তানিয়া। — রান্না করত, নদীতে কাপড় কাচত। কিন্তু তবুও আমি ওকে ভালবাসি না... চল এখান থেকে।

আলিওনার হাতে ধরে তাকে সে নিয়ে গেল সবজি ভূঁইয়ে। ওখানে ফুটছে লাল লাল ফুল।

— তোর ফুল চাই, মা? — তানিয়া জিজ্ঞেস করে তার এলভিরা নামের পুতুলটিকে। এবং একটি ফুল ছিঁড়ে ফেলে।

কিন্তু তক্ষুণি ফুলের পাপড়িগুলো ঝরে পড়ল। থেকে গেল সবুজ একটি গোল গোটা। তানিয়া ওটা ফেলে দিল।

— এই এলভিরা আমায় 'এটা দাও' 'সেটা দাও' বলে জ্বালিয়ে মারল। তবে দাশা আমায় কিন্তু ভীষণ ভালবাসত। দিদিমা কখনও রাগলে সে আমার পক্ষ নিত।

— তোর দিদিমা রাগী? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— ঠিক তা নয়। দাশা তাঁকে যা বলে তা-ই তিনি করেন!.. চল শশা গাছে জল দিয়ে আসি। দিদিমা বলেছিলেন। দেখ, সূর্য ডুবছে।

বাগানে একটি পিপে ছিল। তাতে কালো জল। আলিওনা চেয়ে দেখে ওর মধ্যে রয়েছে পুতুল হাতে একটি মেয়ে। তার মাথার শাদা চুলগুলি ছোট ছোট। পাশে — আরও একটি মেয়ে, সামান্য বড়, মাথা থেকে ঝুলছে কালো বেণী, বেশ সুন্দরও।

তানিয়া আলিওনাকে দিল একটা ঘড়া, নিজে নিল ঝাঁঝরি।

— নে জল ভর।

আলিওনা ঘড়াটি পিপেতে ঢুকাতেই পুতুলগুলি দুলে উঠে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শাদা জামার টুকরোগুলিই শুধু চোখে পড়ল।

— তুই ওর মধ্যে বেশি তাকাবি না, ওতে জলদস্যু আছে, — বলল তানিয়া। — টেনে একেবারে পিপের মধ্যে নিয়ে যাবে।

আলিওনা কিছুই বলল না। সে তাড়াতাড়ি তানিয়ার পেছন পেছন গেল পেঁয়াজ আর গাজর কেয়ারির পাশ দিয়ে। ঠিক এখানেই তানিয়া তখন গাজরের সঙ্গে কথা বলেছিল।

'ওর সঙ্গে আর মিশব না, — ভাবল আলিওনা। — না, মিশব না।'

কেয়ারিতে মাটি ছিল ভুরভুরে ও শুকনো। পাতাগুলি নেতিয়ে পড়েছে, তবে লতাগুলির অবস্থা ঠিকই আছে, ওগুলিতে ঝুলছে বড় বড় শশা। মেয়েরা সাবধানে জল ঢালল যাতে শশার ক্ষতি না হয়। আলিওনা দেখল যে তানিয়া নুইয়ে একটা শশা ছিঁড়ে নিয়ে জামার পকেটে লুকিয়ে ফেলল।

— তোকে দেব না, — বলে সে এলভিরা পুতুলকে। — দাশাকে একা ফেলে এসেছি বনে, আর তুই আমার স্কার্ট ধরে টানাটানি করিস!

আলিওনা জল টেনেই চলেছে। চেষ্টা করে পিপের ভেতরে না তাকাতে। পরে খালি পায়ে এবং কাঁধে তার ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করল। সূর্যও ডুবে গেল জলা আর বনের পেছনে।

— এবার আমি বাড়ি চলি, — বলে আলিওনা।

— কালকে আসিস, — বলে তানিয়া। — তুই সোজাসুজি বাগানের ভেতর দিয়েই চলে যা, এখানে একটি গেট রয়েছে।

আলিওনা চলে গেল, তবে পরে ফিরে এসে ন্যাংটা পুতুলটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

— বোরকাকে নে।

— ঠিক আছে. স্কার্ফটি খুলে ফেল।

— ওর যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

তানিয়া কী যেন ভাবল।

— ঠিক আছে, আজ ও তোর কাছে ঘুমাক। কাল দিস।

আলিওনার ইচ্ছে ছিল না কাল আসে। কিন্তু বোরকা যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আলিওনা চুপি চুপি ঘরে গিয়ে পুতুলটিকে শুইয়ে দেয় নিজের বিছানায়। তখনই হঠাৎ তার মনে পড়ল: 'আর দাশা যে বনে পড়ে আছে?' — এবং গা শিউরে উঠল।

সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

— তুই কোথায় যাচ্ছিস? — চেঁচিয়ে উঠলেন দিদিমা।

— এখুনি আসছি, দিদিমা!

তানিয়ার বাড়ির কাছে গেল সে। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। ঝোপের ভেতরেও অন্ধকার। হঠাৎ ওখানে শাদা কী একটা যেন নড়ে উঠল... ঝোপের মধ্যে ঢুকে হাত বাড়াল পুতুলের জন্য... কিন্তু নেই। পুতুলের পাত্তাই নেই। শোনা গেল তানিয়ার ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

'ঠিক আছে, — ভাবল আলিওনা। — আপাতত ওর সঙ্গে মেলামেশা করব। পরে না হয় দেখা যাবে।'

চতুর্থ অধ্যায়

জেনিয়া সলোমাতিন

সকালে ঘুম থেকে উঠে আলিওনা জানলার ধারে দেখতে পেল জেনিয়া সলোমাতিনকে। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি খুঁটছে। তাকে দেখে আলিওনার ভারি আনন্দ হল:

— জেনিয়া! তুই এখানে কোত্থেকে?

— মারিনো থেকে...

এই জেনিয়া ছেলেটি কথা বলে ভীষণ আস্তে আস্তে, — শেষ অবধি তার কথা শোনার ধৈর্য থাকে না।

— তুইও এখন তাহলে এই বকপুরে থাকবি?

— না, আমরা এসেছি ফসল কাটতে...

— 'আমরা' আবার কারা?

— মানে... আমরা... মরদরা...

— উঁ, কী আমার মরদ রে! — বিদ্রূপ করে আলিওনা। — তুই কখনও ফসল কেটেছিস?

— বাঃ, কাটি নি বুঝি...

— তা কেমন কেটেছিস শুনি?

জেনিয়া কোন জবাব দেয় না, আবার পা দিয়ে মাটি খুঁটছে। ও কখনও মিথ্যা কথা বলে না। যখন বলছে — কেটেছে, তার মানে ঠিকই কেটেছে। তবে কথা হল কাজটি ঠিক তেমন উতরোয় নি।

জেনিয়া এ বছর স্কুলে যাবে। সে অনেককিছুই জানে। তবে কথা বলে ভীষণ আস্তে আস্তে।

— জেনিয়া, আয় ঘরে আয়। দিদিমা আমাদের জাউ খেতে দেবেন। তুই আমাকে কী করে খুঁজে পেলি?

— লোককে জিজ্ঞেস করেছি...

জেনিয়া ঘরে ঢুকল। দিদিমা তাকে তাড়িয়ে দিলেন না, বরং তাকে খেতে ডাকলেন:

— আয় জামাই, জাউ খা!

— দিদিমা। — অবাক লাগে আলিওনার। —তুমি কোত্থেকে জান যে জেনিয়াকে আমার বর বলে ক্ষেপানো হয়।

— তা বুঝতে কি কষ্ট হয়?

জেনিয়া খেয়ে-দেয়ে হাত দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে চলে যেতে প্রস্তুত।

— এত তাড়াতাড়ি তুই কোথায় চলে যাচ্ছিস? — চঞ্চল হয়ে উঠে আলিওনা। — আমরা না হয় একটু বলই খেলতাম।

— না, সময় নেই... — জবাব দেয় জেনিয়া। — বাবা রাগ করবেন...

— তাহলে যা আর কি। তবে শোন, কেবল গ্রামটি একবার চক্কর দিয়ে আসি, কেমন?

— কেন?..

— পরে বলব।

এবং তারা চলে গেল।

— জেনিয়া, তুই বাড়িগুলির নম্বর দেখিস, কেমন? আমি কিন্তু নম্বর জানি না।

— সে আবার কিসের জন্য?..

— পরে, পরে সবকিছু বলব।

— তোদের বাড়ির নম্বর দুই... — পড়ল জেনিয়া।

আলিওনা মাথা নাড়ল:

— অনেকটা পাখির মত, তাই না? যেন বসে আছে। আর এই বাড়িতে কত নম্বর লেখা আছে দেখ তো। এখানে আমার এক জানাশোনা মেয়ে থাকে। নাম — তানিয়া। ওর ঠিক তিনটি পুতুলই আছে। তোকেও হয়তো একটা দিতে পারে খেলার জন্যে।

— হুঃ, তুই... তুই কী যে বলিস!

— আরে আমি যে ভুলেই গেছি। আচ্ছা জেনিয়া, ছেলেরা কি কখনও পুতুল নিয়ে খেলে না?

জেনিয়া উত্তর দিল না। নম্বর পড়তে লাগল।

— এটা তিন নম্বর। দেখছিস?

— হ্যাঁ, অনেকটা পাখির মত, যেন উড়ছে... — বলে আলিওনা। — আর পয়লা নম্বর?

— পয়লা নম্বর বলছিস...

তারা সারা গ্রাম চক্কর দিয়ে ফিরে এল।

— পয়লা নম্বর নেই, — বলে জেনিয়া।

— ভাল করে গুণিস নি! — রাগ করে আলিওনা। — এক নম্বর দেখতে কী রকম তুই হয়তো জানিসই না!

— বাঃ, কী যে বলিস!..

— তাহলে লিখে দেখা তো!

জেনিয়া রেগে উঠে পা দিয়ে লম্বা এক দাগ কাটে বালুর উপর, দাগের মাথায় দেয় টান।

— আরে, এ যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক পাখি! ঠিক এঁকেছিস তো? এটা যে বক!

— বক?.. — জিজ্ঞেস করে জেনিয়া।

আলিওনা তাকে বাড়ি পেঁছে দিতে যায়। যেতে যেতে শাদা বকের গল্প বলে।

— দেখতে হবে তো!.. — বলে জেনিয়া। — ওটা কোন রূপকথা নয় তো?..

— না রে না! বুড়ো লোকেরাই বলছে।

— রূপকথা...

— আরে দুত্তোর!

তারা সরু পথ ধরে বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে বেরল খোলা এক মাঠে। ওখানে শুকনো লতাপাতার দুই ঝুপড়ি। মাঠে ঝোপঝাড়ের কাছে পড়ে রয়েছে কাটা কিছু সবুজ ঘাস, আর এক জায়গায় হঠাৎ দেখা গেল লাল একটি বেঙের ছাতা।

— আরে, দেখ কী সুন্দর! — আলিওনা তাজা বেঙের ছাতাটি তুলে নেয়। — জেনিয়া, চল বেঙের ছাতা তুলি। এখানে এগুলি প্রচুর!

— চল, তোলা যাক... বাবার বালতিটি রয়েছেই।

এবং তারা বেঙের ছাতা তুলতে লাগল। বেঙের ছাতারা লুকিয়ে থাকতে ভালবাসে। লুকিয়ে বসে থাকে। কাছে ঘোরাফেরা করেও খুঁজে পাওয়া যায় না! আর খুঁজে পেলে তারা নিজেরাই সব রহস্য জানিয়ে দেয়। যে প্রথমে খুঁজে পায়, তাকেই সব রহস্য বলে তারা।

প্রথমে পেল জেনিয়া। ও কিন্তু চুপ করে থাকল। আলিওনা নিজেই তা দেখে ফেলে।

— আরে, বেঙের ছাতাটি কী খাসা!

এটির নাম শাদা বেঙের ছাতা। শাদা, কারণ তার টুপিটা নিচের দিকে শাদা রঙের। আর উপর দিক খয়েরী একটু উঁচুনিচু, বেশ মজবুতও। পা'টি শাদা, শক্তও বটে, মাটি থেকে তোলাই দায়!

— আমি আরও খুঁজে পাব, — বলে জেনিয়া।

উটকো হয়ে বসতেই সে আরও পেল। এবারও শাদা।

আর আলিওনা ফার্নের ধারেকাছে খোঁজাখুঁজি করেই চলেছে, কিন্তু ওখানে কিছুই নেই।

— আরও খোঁজ, — বলে সে জেনিয়াকে।

— এক্ষুণি বের করছি...

ওক গাছটি ঘুরে জেনিয়া আবার মাথা নোয়াতেই লতাপাতার নিচে খুঁজে পেল ছোট্ট একটি বেঙের ছাতা, এটিও শাদা!

— আমি কোন কম্মেরই নই, — বলে আলিওনা।

সে ঘাসের উপর বসে পড়ল। সামনে রাখল বালতিটি।

— আমার কপালই খারাপ, তাই না জেনিয়া?

— সব বাজে কথা!..

— আরে না রে না, মা-ই আমায় বলেছেন: 'তুই যদি ছেলে হতি তাহলে কোন কথাই ছিল না। মেয়ে হওয়াতেই যত গণ্ডগোল!'

— তার মানে তোর ভাইয়ের কপাল ভাল?..

— কোন ভাইয়ের?

— আরে তুই জানিসই না?

— তুই কী ভীষণ হাবা, জেনিয়া! আসল জিনিসটিই বলছিস না! কে বলল তোকে?

— তোর বাবা ট্রাকে করে যাওয়ার সময় আমার বাবাকে চেঁচিয়ে বলেছে...

জেনিয়া থেমে গেল। সে খুব ধীরে ধীরে কথা বলে। আলিওনার মোটেই তর সইছে না।

— কী রে?! কী বলেছেন?

— বলেছে, 'ছেলের বাপ হয়েছি'।

— বাঃ, কী মজা, না জেনিয়া!

আলিওনার আনন্দ কে দেখে। নাচতে শুরু করে দেয়। হুঁচোট খায় বালতিতে, হাড়ে বেশ লাগে। তবে হয় নি কিছু। আবার জিজ্ঞেস করে:

— ভাইটি দেখতে কী রকম? বাবা কোনকিছু বলে নি?

— না...

— চল, এবার বাড়ি যাওয়া যাক, বেঙের ছাতা আর তুলতে হবে না, ঢের হয়েছে!

আলিওনা ছুটে চলে সরু পথে, খালি পায়ে যে কাঁটা ফুটতে পারে সেদিকে খেয়ালই নেই তার।

— আরে একটু দাঁড়া! — দূর থেকে চেঁচায় জেনিয়া, সে হাঁটেও ধীরে ধীরে। আর তার তাড়াই বা কিসের? ভাই তো আর তার হয় নি!

পথটি হঠাৎ পাক খেয়ে চলে গেছে র‍্যাজবেরির বাগানে। পাকা ফল ওখানে প্রচুর। ছুঁতেই ঝরে পড়ে মাটিতে।

— আয় জেনিয়া, র‍্যাজবেরি খেয়ে দেখ। এদিকে, এদিকে আয়।

— তোদের এখানে দেখছি কালো ক্যার‍্যান্ট রয়েছে, — বলে জেনিয়া। — লাল ক্যার‍্যান্টও...

আর তারপর ঝোপের ভেতরে চলে যায়:

— গুজবেরিও আছে।

হঠাৎ আলিওনা অবাক হয় এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে। সে দেখে যে তার সামনে ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওই সেই ফারগাছটি যার তলায় একদিন সে বেঙের ছাতা রেখেছিল। সবকিছুই চেনা!

ঘাসগুলো ওখানে তখনও এলোমেলো। এখানে ওখানে পড়ে রয়েছে বেঙের ছাতা থেকে ফেলে দেওয়া শাদা-শাদা কিছু ছিলকা।

আরও ভাল করে দেখল আলিওনা। ওই যে লতাপাতায় ঢাকা পথটি। তেমন জঙ্গলও নয়। এবার আর হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই।

হঠাৎ তার খেয়াল হল — হাত তো খালি: বালতিটি রেখে এসেছে র‍্যাজবেরির বাগানে।

আলিওনা জেনিয়াকে নিয়ে পথে বেরিয়ে আসে। সে কিছুই বলে না। কেবল গ্রামের কাছে পৌঁছে আলিওনার প্রশংসা করে!

— সাবাস আলিওনা, তোর চোখগুলি কিন্তু খাসা।

— সত্যিই বলছিস?

— তা নয় তো কী?

পঞ্চম অধ্যায়

তিনজনে

তারা সরাসরি সবজি ভুঁইয়ে বেরিয়ে এল। বেড়ার ধারে একটু নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া। ও ভান করছে যেন আগাছা সাফ করছে, কিন্তু আসলে আড়চোখে দেখছে কে বন থেকে বেরল। নেতিয়ে যাওয়া এক গোছা আগাছা জায়গায়ই পড়ে আছে, তাতে একটাও তাজা ঘাস পড়ে নি।

— জেনিয়া, এই হল আমার নতুন বান্ধবী তানিয়া।

— আচ্ছা... — বলে জেনিয়া।

— তানিয়া! — ডাকে আলিওনা।

মেয়েটি কিন্তু মাথাই তুলল না। কেবল কালো বেণীটি পেছনের দিকে ঠেলে দিল যাতে কাজ করতে বাধা না দেয়। হাত চালিয়ে কাজ করতে লাগল সে: কপ-কপ-কপ! আগাছা আর ঘাসগুলি উড়ে যেতে লাগল কেয়ারি থেকে। আলিওনা আর জেনিয়া যখন একেবারে কাছে পোঁছল, তানিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাঁকা কনুই দিয়ে লাল মুখটি মুছল এবং বেণীটি সামনে টেনে এনে একটু হাসল।

— তানিয়া, জানিস আমার ভাই হয়েছে! — বলে আলিওনা।

— আর তোর দিদিমা তোকে খুঁজছেন, — জবাব দেয় তানিয়া। — এত সকালে কোথায় গিয়েছিলি?

তানিয়া কথা বলছে আলিওনার সঙ্গে, কিন্তু তার চোখ জেনিয়ার দিকে। আলিওনাও সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল যে জেনিয়ার পাগুলি ভীষণ নোংরা, একেবারে কালো, হাঁটুর কাছে পেন্টও ছিঁড়ে

গেছে। আর এদিকে তানিয়া পরেছে পরিষ্কার জামা, পায়ে লাল মোজা আর সেন্ডেল। একেবারে ফিটফাট সুন্দরী।

— তুই আগাছা সাফ করতে জানিস? — জেনিয়াকে জিজ্ঞেস করে তানিয়া।

— সে কি কোন কঠিন কাজ? — বলে জেনিয়া।

— আয় তাহলে, এই কেয়ারিটি সাফ করে নিই, দিদিমা বলেছেন। আর তারপর বাঁধে স্নান করতে যাব। তবে কাউকে বলব না, কেমন? তোরা বলবি না তো?

— আরে দূর কাকে বলব! — বলে আলিওনা।

— নিশ্চয়ই না... — সায় দেয় জেনিয়া।

— ব্যস, চমৎকার। দিদিমা জানতে পারলে ভীষণ বকবেন কিন্তু!

জেনিয়া নুইয়ে চুপচাপ ঘাস ছিঁড়তে লাগল। ঘাসে ধরে যখন টান দেয় দেখে যে তার শিকড়টি বিরাট — অনেকটা শাদা অজগরের মত, আর তা থেকে বেরিয়ে আছে আরও অনেকগুলি শাদা শাদা ছোট শিকড়। এমনকি শোনা যায় কীভাবে ঘাসগুলি জড় সমেত উঠে আসছে মাটি থেকে। ঘাস তুলতে তুলতে হঠাৎ নিজের অজান্তে জেনিয়া একটা পেঁয়াজ তুলে ফেলে।

লজ্জায় জেনিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল। সে পেঁয়াজটি ফের মাটিতে পুতে দিয়ে আড়চোখে তানিয়ার দিকে তাকাল। তবে ও বোধ হয় কিছুই টের পায় নি।

তারা আগাছা সাফ করে এইভাবে:

আলিওনা আর জেনিয়া হাত দেয় কেয়ারির একেবারে শুরুতে — একজন ডান দিক আর অপর জন বাঁ দিক থেকে। আর তানিয়া একা অন্য মাথায়... এইভাবে তারা এগিয়ে যায় পরস্পরের দিকে। আলিওনা আর জেনিয়া অবশ্য তাড়াতাড়ি কাজ করে — তারা তো দু'জন! তবে তানিয়াও পিছিয়ে পড়ে নি: কপ-কপ-কপ!.. এ কাজে তানিয়ার পাকা হাত।

আলিওনা হয়তো আরও তাড়াতাড়ি কাজটি সারতে পারত, কিন্তু জেনিয়াকে নিয়েই যত ঝামেলা! ও যে কী ধীরে ধীরে কাজ করে আলিওনা চায় না সেটা তানিয়া জানুক। তাই আলিওনা জেনিয়াকেও মদদ করে।

আগাছা তোলার কাজ সারল তারা। শেষ ঘাসটি তুলে তানিয়া হঠাৎ হেসে উঠে প্রথমেই ছুটে গেল পিপের দিকে হাতমুখ ধুতে। তার পেছন পেছন ছুটল আলিওনা। আর সবার শেষে আস্তে আস্তে পিপের কাছে গেল জেনিয়া। হাতমুখ ধোয়ার পর তানিয়া হাত থেকে জল ঝাড়তে লাগল এবং জেনিয়াকে জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল। এমন ভান করল যেন সে ইচ্ছে করে তা করে নি।

— আরে... এ কী করছিস তুই? — ফিরে দাঁড়ায় জেনিয়া।

— আহা, বেচারা! — হেসে উঠে তানিয়া। — তুই খুব একটা ধুবিটুবি না, আমরা যে এমনিতেই স্নান করতে যাচ্ছি।

— স্নানটান আমি তেমন একটা পছন্দ করি না...

— তা করবি কেন, সুন্দর হয়ে যাবি যে, আর বেশি সুন্দর হলে কাকেরা চুরি করে নিয়ে যাবে। তাই না, আলিওনা?

— জানি নে।

— ওতে জানার কী আছে? — জেনিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কথায় মন দেয় তানিয়া: — আমার ন্যাংটা বোরকার খবর কী? রাত্রে কাঁদে নি?

বোরকার কথা আলিওনার মনেই ছিল না। তানিয়াকে দিতেই ভুলে গেছে।

— আমি ওকে এক্ষুণি নিয়ে আসছি, কেমন?

— যাক, পরে দিলেও চলবে, — বলে তানিয়া। — তোর দিদিমা হয়তো ওকে খাইয়ে দিয়েছেন। জানিস, আমার দাশা বাড়ি ফিরেছে। কী পাজি ও — ওকে নিয়ে আর পারি না!

— কেন, ও কী করেছে? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— হুঃ কী করেছে! আমি বলেছিলাম, ওকে বনে ফেলে আসব, আর তা শুনে ও ছোট ছোট পাথর দিয়ে তাড়াতাড়ি পকেট ভরে নেয়। যাওয়ার সময় চুপি চুপি ওগুলি পথে ফেলতে থাকে। তারপর ব্যস ওই পাথরগুলি দেখে দেখেই বাড়ি ফিরে আসে।

জেনিয়া হাঁ করে শুনে তাদের কথা।

— কার কথা বলছিস তোরা?..

— আমার মেয়েটির কথা। আমি ওকে বনে ফেলে আসি। ভাবলাম, নেকড়েরা খেয়ে নেবে। কিন্তু ও ফিরে এসেছে। যাক গে, আমি বরং খুশিই হয়েছি, — জবাব দেয় তানিয়া এবং বেণীটি ঠেলে দেয় পেছনে। — যাওয়া যাক।

তারা তিনজনে ছুটে যায় গ্রামের ভেতর দিয়ে। পরে ফিরল খালের দিকে। খালের উপরে আড়াআড়িভাবে আছে মাটির বাঁধ। ওপারে মাঠ, ওখানে গরু চরানো হয়। গরুরা খালে জল খায়। তাই ও-পারে সর্বত্র খুরের দাগ। আর এ-পারটি একটু খাড়া, তবে নিচে বালু রয়েছে। বেশ স্নান করা যায়।

আলিওনা জামা ছেড়ে তা ঝোপের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে। তারপর ছুটে যায় জলের মধ্যে। উষ্ণ জল, তাতে কাদা, উইলো আর দুধের গন্ধ...

বাঃ, কী মজা! — চেঁচাতে চেঁচাতে জলে চাপড় মারে সে। — তাড়াতাড়ি আয় তোরা!..

আর তারপর 'সাঁতার দিয়ে' তীরে চলে আসে: পলি-ভরা তলা আঁকড়ে ধরে পা দিয়ে জল ছিটাতে থাকে।

জেনিয়া কাপড় ছাড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু তানিয়ার দিকে তাকিয়ে ছাড়ল না।

আর তানিয়া সেন্ডেল আর মোজা পায়েই নামতে লাগল খালের দিকে।

এত সেজেগুজে কোথায় নামছে ও?

নামল, তবে জলে নয়; ঝোপের কাছে ঘাসের উপর বসে পাদু'টি ছড়িয়ে দিল।

— এখানে জল নোংরা, — বলে সে। — তোদের মারিনোতে খাল আছে?

— আছে... — জবাব দেয় জেনিয়া। — তা কী হয়েছে?

— শিগগিরই বকপুর গ্রামের লোকেরা তোদের মারিনোয় উঠে আসবে।
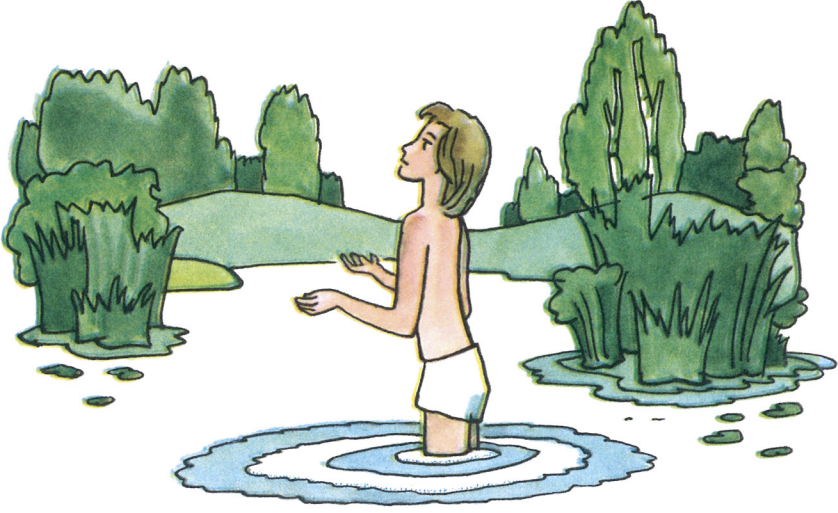
— তাই তো সবাই বলছে.. — মাথা নাড়ে জেনিয়া। — এখান থেকে চলে যেতে খারাপ লাগছে না?

— আমার কাছে সবই সমান। এখানে একঘেয়ে লাগে।

— আমাদের ওখানে কী সুন্দর খাল আছে! — জল থেকে চেঁচায় আলিওনা।

— তুই কী রে, সাঁতারও শিখলি না? — বলে তানিয়া।

— ও এখনও ছোট... — জবাব দেয় জেনিয়া। — শিখে ফেলবে।

— আর তুই, জেনিয়া, কেন এত ধীরে ধীরে কথা বলিস?

শুনে আলিওনা তো থ। ও রকম কথা জিজ্ঞেস করতে আছে?

জেনিয়া কিছুই বলল না। তার মুখ লাল। খালের ধারে গিয়ে উইলোর ডাল ভাঙতে লাগল।

— স্নান করবি না? — আলিওনা জিজ্ঞেস করে।

— না...

— তাহলে আমিও করব না।

আলিওনা জল থেকে উঠে এসে জামাকাপড় পরে নিল। সকাল বেলার মত এখন আর তার মনে তেমন একটা ফুর্তিটুর্তি নেই। মনে পড়ল, বাড়িতে দিদিমাকে বলে আসে নি।

আর এই তানিয়া মেয়েটি... 'ওর সঙ্গে ভাব করব না,' — আবার ভাবল আলিওনা।

— আমি তাহলে চললাম! — পারে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে বলল সে। — তুই যাবি, জেনিয়া?

— যাব... — উত্তর দেয় জেনিয়া।

তানিয়াও উঠল। সুন্দর জামাটি একটু ঝেড়ে নিল।

— দাঁড়া, আমিও আসছি। — এবং চলতে লাগল তাদের সঙ্গে।

কারো মুখে কথা নেই। আলিওনা হাঁটছে তাড়াতাড়ি, কপাল কুঁচকাচ্ছে। জেনিয়া মাথা নিচু করে যাচ্ছে উইলোর ডাল নাচাতে নাচাতে। আর তানিয়া গুণ-গুণ করছে আর মৃদু হাসছে। তারা সবাই যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, হঠাৎ তানিয়া আলিওনাকে জড়িয়ে ধরল:

— জানিস আলিওনা, মা যদি আপত্তি না করেন তাহলে ন্যাংটা বোরকাকে তোকে দিয়ে দেব একেবারে।

— দরকার নেই, — জবাব দেয় আলিওনা এবং তানিয়ার হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে যায় বাড়ির দিকে।

দেউড়িতে দিদিমা দাঁড়িয়ে।

— আলিওনা! লক্ষ্মী আমার! কোথায় ছিলি এতক্ষণ...

আলিওনা দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে। তাঁর গালগুলি ছিল নরম, একটু উষ্ণ ও ভেজা। ভীষণ লজ্জা হল আলিওনার!

— দিদিমা, ও দিদিমা, রাগ কেরো না... — আবদারের সুরে বলে আলিওনা।

দিদিমা হাসেন:

— ঠিক আছে, তোরা ঘরে এসে খেতে বোস্। সুপ হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সবাই তারা বসল।

— দিদিমা, আমি পাশা কাকুর বালতিটি বনে হারিয়ে ফেলেছি, — হঠাৎ বলে আলিওনা।

— সে কী করলি তুই?

— আমি আর জেনিয়া র‍্যাজবেরির বাগানে গিয়েছিলাম। ওখানে আরও কত ফল...

— ও জায়গা আমার চেনা, — মাথা নাড়েন দিদিমা।

— ওখানে কার পায়ের দাগ রয়েছে, — বলে জেনিয়া।
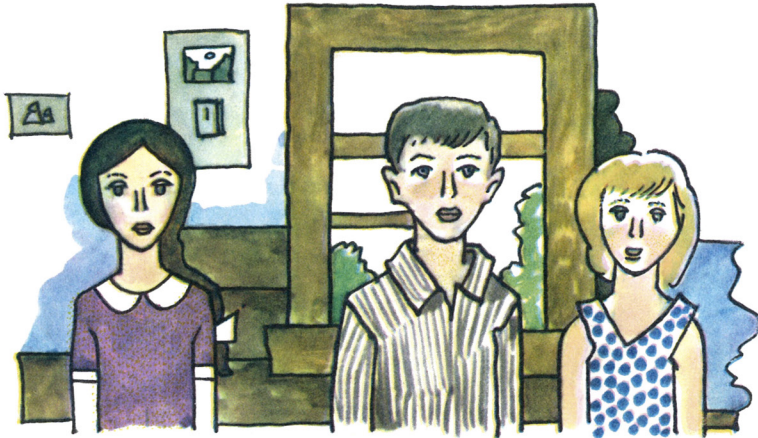
— আমি কালই বালতিটি নিয়ে আসব, — বলে আলিওনা। তার মনের আনন্দ আবার ফিরে এল। নিজের দিদিমাকেও তার ভাল লাগে। দিদিমাটি কিন্তু খুব ভাল।

— না, এবার কিন্তু একসঙ্গে যাব, — বলেন দিদিমা। — আর তোদের একা ছাড়ব না। বনে পথ হারিয়ে ফেলেছিলি? অনেকখন ছিলি?

— আমরা, দিদিমা, প্রথমে তানিয়াদের সবজি ভুঁইয়ে আগাছা সাফ করি, আর তারপর বাঁধে স্নান করতে যাই, — হঠাৎ সবকিছু ফাঁস করে দেয় আলিওনা। সে কথাটি বলতে চায় নি, কিন্তু চুপ থাকতে কিংবা মিথ্যা বলতেও পারে নি। এখন তার মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখ ছলছল করে উঠল, প্লেটে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল অশ্রু — টপ্ টপ্...

— আরে কী হল তোর, বোকা মেয়ে?

— দিদিমা, তুমি তানিয়ার দিদিমাকে ও-কথা বলো না, কেমন?

— ঠিক আছে, বলব না। অপরকেও ঠকানো খারাপ। খাওয়া শেষ? ঠিক আছে এবার তোরা বেড়াতে যা।

— আমি বাবার কাছে... — বলে জেনিয়া। বেঞ্চিতে হাত দিয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে সে। — ও হ্যাঁ, আমি টুপিটি তানিয়ার ওখানে ফেলে এসেছি...

— বেশ নিয়ে আয়, — বলে আলিওনা। — আমি যাব না। কাল আসিস!

— ঠিক আছে...

আলিওনা সিন্দুক থেকে রঙীন একটি কম্বল নিয়ে বেঞ্চিতে পেতে শুয়ে পড়ল। চোখগুলি আপনা থেকেই বুজে গেল। চোখের সামনে ভাসতে লাগল গাছপালা, ঝোপঝাড়, খালের হলদে মসৃণ জল...

— দিদিমা, তুমি বাসন ধুবে না। আমি উঠে...

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে ছাড়া কি আমার আর গতি আছে?
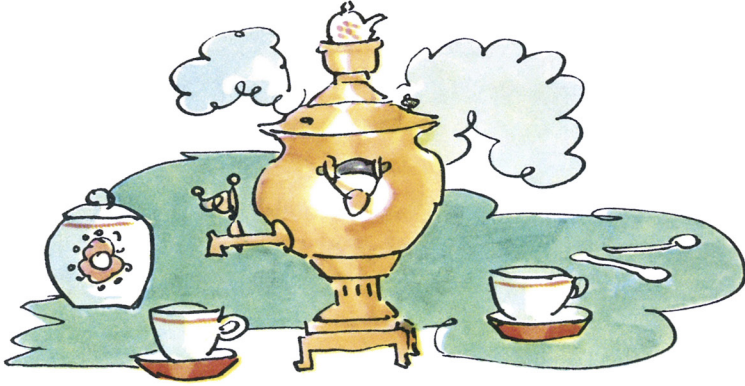
ষষ্ঠ অধ্যায়

বোরকা

স্বপ্নে আলিওনার মনে পড়ল: তার ভাই হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল:

— দিদিমা, আমার যে ভাই হয়েছে!

— জানি।

দিদিমা তখন চায়ের জন্যে জল বসাচ্ছেন, চিলতে ফেলছেন আগুনে।

— কী করে জানলে?

— তুই যখন বনে ছুটাছুটি করছিলি, তোর বাবা এসেছিল।

— বাবা এসেছিলেন? আমাকে নিয়ে যেতে?

— না, আলিওনা; ও কোন কাজে খামারে যাচ্ছিল। শিগগিরই আমাদের বকপুরের সবাই তোদের গ্রামে উঠে যাবে। শুনেছিস?

— শুনেছি। তবে কীভাবে উঠে যাবে?

— খুবই সোজা। বাড়িঘরের কড়িবরগা সব খুলে নিয়ে যাবে। আর কোন্ জিনিস কোথায় লাগানো ছিল তা যাতে গুলিয়ে না যায় সেজন্য জিনিসগুলিতে নম্বর বসানো হবে: এক, দুই, তিন...

— আর, দিদিমা, তুমিও আমাদের ওখানে চলে আসবে?

— জানি নে। এ জায়গা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের বকপুর কি খারাপ?

— এখানে ভালই, দিদিমা। থেকে থেকে অভ্যাস হয়ে গেছে।

— কিন্তু তোর মন তো বাড়ির দিকেই।

— তা নয়, আমি শুধু ভাইকে দেখতে চাই। ওর সঙ্গে একটু খেলেই চলে আসব।

— আরও কত খেলবি! ও যে পুতুল নয়, — এবং খাটের দিকে তাকিয়ে বলেন, — শুয়ে আছে তো আছেই, একেবারে চুপচাপ।

আলিওনা উঠে কম্বলটি ভাঁজ ক'রে রেখে ন্যাংটা বোরকাকে হাতে নিল। ওটা যদি তার নিজের পুতুল হত, তাহলে সে তাকে কী ভালই না বাসত! পুতুলটি দেখতে ভাল, তবে চোখগুলি একটু রাগী-রাগী।

— দিদিমা, ওর নাম কী রাখা হয়েছে?

— তোর ভাইয়ের? বোরকা।

— আরে!

— কী হল তোর?

— এই ন্যাংটা পুতুলটির নামও বোরকা! আচ্ছা, দিদিমা, ও দেখতে কার মত?

— আমি ওকে দেখি নি।

— দিদিমা, ওর চোখ রাগী-রাগী নয়?

— হায় ভাগবান! তুই কী বলছিস ওসব!

— আর এই বোরকার চোখগুলি রাগী-রাগী। দিদিমা, আমি পুতুলটি দিয়ে আসি তানিয়াকে, কেমন?

— আচ্ছা, যা।

আলিওনা বেরিয়ে গেল। বাইরে আর তেমন গরম নয়। সূর্য একেবারে ডুবে না গেলেও এই ডুবুডুবু করছে। আলিওনা এল তানিয়ার বাড়ির কাছে, আর তানিয়া জানলার নিচে বেঞ্চিতে বসে আছে।

— বোরকাকে নিয়ে এলি যে? ও তোকে জ্বালাচ্ছে?

আলিওনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ও।

— না, অনেক খেললাম তো।

— দে তাহলে। পরের নামে লাগাতে লজ্জা করে না?

— সত্যিই কি জেনিয়া বলেছে?

— আর কে বলতে পারে! আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছি, তাই ও বলেছে।

— জেনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলে না! — আলিওনা খুশি হয়। — মিথ্যে একদমই বলতে পারে না!

— আর তুই — বলে রাগের চোখে তাকায় তানিয়া, — আর তুই কোন কথাই পেটে রাখতে পারিস না।

— পারি, খুব পারি! — রেগে যায় আলিওনা। — ভালই পারি! দিদিমাকে মিথ্যা কথা বলতে নেই। আমার দিদিমা ভাল মানুষ।

— আর আমার দিদিমা বুঝি খারাপ? — জবাব দেয় তানিয়া। — কথা যখন দিয়েছিস বলবি না...

— আমার দিদিমা তোর দিদিমাকে বলবে না যে।

— 'আমার দিদিমা', 'তোর দিদিমা,' — ভেংচি মারে তানিয়া। — আর তোর জেনিয়াটা একেবারে ভোম্বলদাস। সবকিছু বলে চেঁচিয়ে। ব্যস দিদিমাও শুনে ফেললেন। এবার কাল আমাকে ঘাস-কাটায় নিয়ে যাবেন না।

— কোথায়?

— ঘাস-কাটায়। বিচালি নেড়েচেড়ে দিতে।

— আমিও যেতে চাই।

— যা না। আমার কী!

তানিয়া আবার মুখ ফিরিয়ে নিল। ন্যাংটা বোরকাকে বেঞ্চিতে বসিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল, যেন আলিওনা ওখানে নেই।

— কী রে হাবা, পরের বাড়িতে থেকে থেকে সখ মিটে গেছে? পরের ঘরে মন্দ নয়, তবে নিজের ঘরে সবচেয়ে ভাল। তাই না? তোকে হয়তো চান করায় নি? খেতেও দেয় নি?

— দিদিমা ওকে খাইয়েছেন, — বলে আলিওনা, তার প্রায় কান্না এসে গেছে।

আর তানিয়া আবার:

— না খাওয়ালেও কিছু যায় আসে না। এক্ষুণি জাউ বসাচ্ছি...

'জাউ বসাচ্ছি'! অথচ নিজেই মেয়েকে বনে ফেলে এসেছে নেকড়ের মুখে... আলিওনা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়। ওর খুব মনে লাগল! কী রকম মেয়ে এই তানিয়া!.. বাবাও এসে একটু অপেক্ষা করেন নি। কেউ তাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না, কেন? কারণ কেউ তাকে ভালবাসে না।

গালে হাত দিয়ে দেউড়িতে বসে পড়ল আলিওনা।

দিদিমা ঘর থেকে বেরিয়ে বসলেন তার পাশে:

— তোর মন খারাপ কেন?

— তুমি আমায় ভালবাস, দিদিমা?

— তুই আমার সোনা। তোকে ভালবাসব না তো কাকে ভালবাসব?

— দিদিমা, আমি তোমার কাছেই থেকে যাব। সব সময় তোমাকে সাহায্য কর্রব। সবজি ভূঁইয়ে আগাছা সাফ করব, জলও দেব। শুয়োরছানাকেও খাওয়াব।

— এখানে তোর মন বসবে না, — হাসেন দিদিমা। — আমি যে বাঁধে স্নান করতে যাই না।

আলিওনার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

— আমি, দিদিমা, চান করতে ভালবাসি না। সাঁতারই শিখি নি।

— ঠিক আছে। কাল আমরা ঘাস কাটতে যাব। যাওয়ার পথে বালতিটিও তুলে নেব, কেমন?

আলিওনা সি'ড়িতে উঠে এমনভাবে দিদিমার মাথা জড়িয়ে ধরল যে তাঁর মাথার পুরনো স্কার্ফটি আর জায়গায় থাকল না, পিছলে পেছনের দিকে চলে গেল।
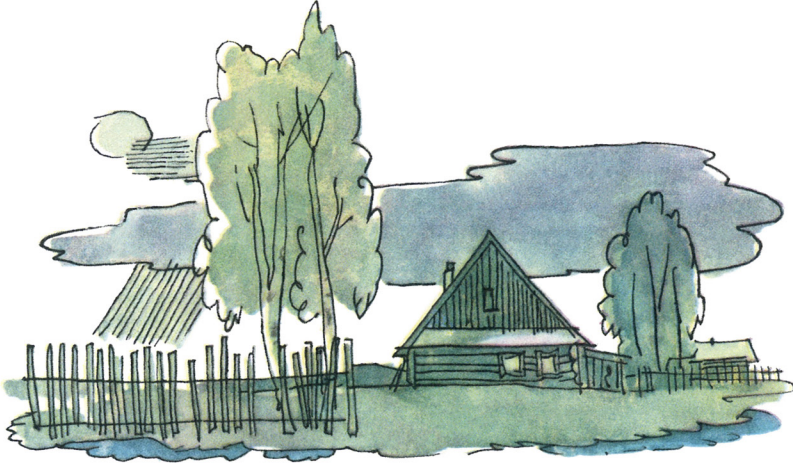
সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাৎ

দিদিমা খুব ভোরে আলিওনাকে ঘুম থেকে তুললেন:

— ধীরে ধীরে উঠে পড়। এক্ষুণি বেরুব।

বার-বারান্দায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আলিওনা তার শাদা চুলগুলো আঁচড়ে নিল পরিষ্কার একখানি চিরুণী দিয়ে।

— এই স্কার্ফটি নে। পরে মাথায় পরে নিস, — বললেন দিদিমা। — আর জামা নিবি লম্বা হাতাওয়ালা, রোদে হাত পুড়ে যেতে পারে।

— তুমি যে কী বল দিদিমা, আমি তো এমনিতেই রোদে ছুটোছুটি করি।

— আমি যা বলছি শুন। আমার সবকিছু ভাল জানা আছে।

সকালের খাবার খেয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল। দিদিমা সঙ্গে একটি থলে নিলেন — ওতে রাখলেন ডিম, আলু, শশা। তারা যাচ্ছে বুনো পথ ধরে।

— বেরি বাগানে যাব? — জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

— যাব।

ঠিক ওই পরিচিত ফারগাছটির কাছে পৌঁছেই তারা ডান দিকে মুড়ল। গাছটি তখন আলিওনার সমান।

একটু এগিয়ে যেতেই মনে হল বনটি যেন অন্য রকম — ঝোপঝাড়ে ভরা, আগের চেয়ে ঘন।

আলিওনা ছুটে আগে আগে, চেয়ে দেখে চারিদিকে। এখানেই সে কাল বেরি খেয়েছে। আর এখান থেকেই ভয়ে দৌড় দেয় জেনিয়া। জায়গাটি ঠিক চেনা। এই তো বালতিটি ঝোপের নিচে। আলিওনা খুশি। বালতিটির ভেতরে সে তাকাল, আর ওতে... জান কী? আপেল!.. অনেকগুলি আপেল...

— দিদিমা! — চুপি চুপি ডাকে আলিওনা।

দিদিমার কানে গেল না তার ডাক। আলিওনা চোখ মুছে আবার তাকাল। সত্যিই আপেল!

— ও মা! — চেঁচিয়ে উঠেই আলিওনা দিল এলোপাতাড়ি দৌড়। খেল কারো সঙ্গে ধাক্কা, প্রথমে খুশি হল, ভাবল — দিদিমা! পরে নিচের দিকে তাকাতেই দেখে — হাইবুট। অমনি পিলে চমকে উঠল।

বিরাট হাইবুটগুলি শিশিরে ভেজা। পরনে পুরনো ডোরা-কাটা পেন্ট। নীল কোট। মাথা তুলতেই দেখে — তার মাথার উপর ঝুলছে শাদা শাদা দাড়ি।
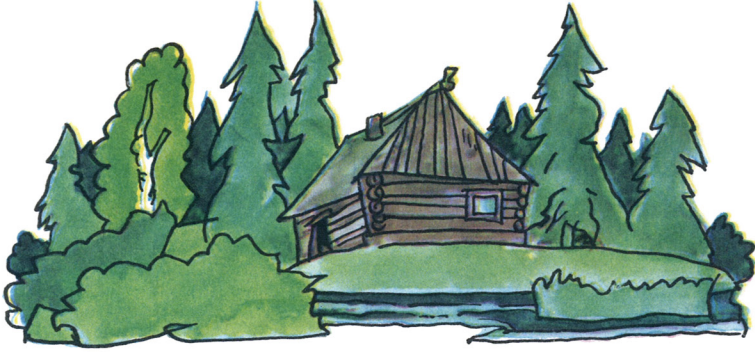
অষ্টম অধ্যায়

দাদু

আলিওনা ছুটে যেতে চায়, কিন্তু দাদু ওর হাত ধরে রেখেছেন, ছাড়ছেন না:

— থাম, ছটফট করিস না। দিদিমা কোথায়?

— আমি এখানে, — সাড়া দেন দিদিমা। — কেন তুমি ওকে ভড়কে দিয়েছ? দেখো তো — বেচারীর মুখ ভয়ে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

— ও-ই আমাকে ডরিয়েছে, আমি নই। হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এল পাখির মত। — হেসে ফেলেন দাদু। একটিও দাঁত নেই। আর মুখটি তার প্রশস্ত, চোখগুলি উজ্জ্বল।

— পাখিদের ভয় করতে শুরু করেছ কবে থেকে? — হেসে দিদিমা বাড়িয়ে দেন তাঁর হাতটি। — তারপর কেমন আছ? কবে এলে এখানে?

— তিন দিন হয়ে গেছে।

— তুমি হচ্ছ একটি ভবঘুরে! — মাথা নাড়েন দিদিমা। — কোনকিছু পেয়েছ?

— তা কী মনে করেছ! এমনসব চারাগাছ নিয়ে আসবে, দেখলে তুমি জায়গায় বসে পড়বে।

আচ্ছা বেশ লোক তো এরা — দিদিমা আর বুড়োটি আগে থেকেই পরিচিত। তাই তারা নিজের কথায় মেতে গেছে।

— তাহলে বকপুর ছাড়ছ? — জিজ্ঞেস করেন দাদু।

— কী আর করা? খালি গ্রামে একা পড়ে থাকা তো যায় না?

— একা কেন? আমি তো রয়েছি, না আমি মানুষ নই? এখানে বাগান আছে, বুঝলে? কত কাজ! থাক্যও যাবে খুশ মেজাজে!

কী আশ্চর্য — র‍্যাজবেরির বাগানের প্রান্তে বার্চগাছের বদলে হঠাৎ চোখে পড়ল আপেল গাছ। ওগুলিতে ঝুলছে লাল-শাদা আপেল। আপেলের গায়ে রোদ এসে পড়েছে। কোথাও রোদ, কোথাও ছায়া। আপেলগুলি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে লেগে আছে ডালে ডালে, যেন ঠেলাঠেলি করছে। চকমকও করছে না ওগুলি, কিছুটা কুয়াশাচ্ছন্ন।

আর আপেল গাছের পেছনে — চেরি। দেখে মনে হয়, ডালে ডালে যেন লাল আলো জ্বলছে।

গাছের নিচে উঁচু উঁচু ঘাস, আর ঘাসের মধ্যেও যেন আলো জ্বলছে — পড়ে রয়েছে লাল বেরি আর আপেল।

আর বাগানের উপরে — আকাশ। চারিদিকে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। শোনা যাচ্ছে কেবল মৌমাছিদের গুণগুণ, ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে তারা। পেটগুলি তাদের হলদে, লোমে ভরা, আর ঠেংগুলি পরাগের ওজনে ভারি হয়ে আছে। এত সুন্দর বাগান আগে কখনও দেখে নি আলিওনা।

এ আবার কী! আপেল গাছগুলির ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির ছাদ। ছাদটি ধূসর রঙের, চিলেকোঠায় ছোট্ট একটি জানলা। এবার ঝোপঝাড়ের ফাঁকে পুরো ঘরটিই চোখে পড়ছে। ঘরটি পুরনো, নিচু, ধূসর।

আলিওনা কোন মতেই বুঝে উঠতে পারে না, এই ঘরটি দেখতে অন্যগুলির মত নয় কেন। গ্রামেও তো পুরনো বাড়িঘর রয়েছে। কিন্তু ওগুলি তো এ রকম নয়। তার মানে এটা নিশ্চয়ই ওগুলোর চেয়ে অনেক অনেক বেশি পুরনো। তাছাড়া আলিওনা আরও লক্ষ্য করল: গ্রামের বাড়িগুলির ধারেকাছের জমি হামেশা পা-মাড়ানো থাকে, কিন্তু এখানে — বুনো মাঠ। ঘাসগুলিতে মানুষের পা-ই প্রায় পড়ে নি। দেউড়ি ছেয়ে ফেলে ঘাস জানলা স্পর্শ করতে চলেছে।

— ভেতরে আসা হোক, মহামান্য অতিথিরা, — তামাসা করেন দাদু।

ঘরের বার-বারান্দাটি খালি, কিছুই নেই ওখানে। একটি মাত্র কামরা। বেশ বড়। তিনটে ছোট জানলা। ঘরময় আপেলের গন্ধ। মেঝে কিছুদিন আগে মোছা হয়েছে। পাপোশের বদলে মেঝেতে ঘাস ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। বেঞ্চিটিও ঘষে পরিষ্কার করা। টেবিলে রুটি আর চিনির প্যাকেট। এ রকমের চিনি বাবা শহর থেকে এনেছিলেন।

— তুমি কারো অপেক্ষা করছিলে নাকি? — সবকিছু দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

— আমি তোমাদেরই অপেক্ষা করছিলাম। বাগানে একটি বালতি খুঁজে পেলাম, ভাবলাম — তার মানে অতিথি আসবে। এক্ষুণি চায়ের জল বসাচ্ছি।

দাদু রান্নাঘরে চলে গেলেন। শোনা যাচ্ছে কীভাবে তিনি চিলতে টুকরো করছেন ও গুণগুণ করে গাইছেন:

সুন্দর আমার শাদা পাখি,
তোর পথ পানে চেয়ে থাকি...

আলিওনা চুপ করে কান পেতে শুনে।

উড়ে আয় ও আমার পাখিরে,
বাঁধবি বাসা আমার ঘরে।

বুড়ো চুপ হয়ে গেল। আলিওনা ভাল করে ঘরটি দেখতে লাগল। দেয়ালগুলি কাঠের, খালি, কোন ফোটো নেই। এ রকম ঘর গ্রামে আর কারো নেই।

দুই জানলার মাঝখানে দেয়ালে ঝুলছে কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো বড় একখানা আয়না। আলিওনা ওতে নিজের চেহারা দেখে হেসে উঠল: আয়নাতে তার গালগুলি ফুলা-ফুলা, নাকটি চেপ্টা, আর চোখগুলি চলে গেছে বিভিন্ন দিকে। তারপর মাথাটি একটু নাড়াল — ব্যস, এবার মুখটি শশার মত লম্বা, নাকটিও তাই, আর চোখগুলি কোথাও যেন গালে চলে এসেছে!

— দাদু! — হেসে হেসে ডাকে আলিওনা, এবং তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল।

দেখতে পায়: আয়নার পেছনে ঝুলছে লম্বা একটি শাদা পালক। মুরগির নয়। তাছাড়া দাদুর কোন মুরগিই নেই। না, ওটা মুরগির পালক নয়। কোন পাখির পালক। আলিওনা পা টিপে টিপে গেল পালকটির কাছে, হাত বাড়াল, কিন্তু ছুঁতে সাহস হল না।

সুন্দরী পাখিটি সাড়া দেয়:

আমি তোর কাছে আসতাম চলে,
যদি না বনে থাকত আমার ছেলেপিলে।

— দিদিমা! — চুপি চুপি ডাকে আলিওনা। — শুনছ, কী গাইছে ও?

— কী হল? — বুঝতে পারেন না দিদিমা।

— তোমার গানটি গাইছে...

— কীসব বাজে বকছিস...

— তোমরা ওখানে কী এত ফিসফিস করছ? — টেবিলে চা রাখতে রাখতে বলেন দাদু। — এস চা খাওয়া যাক।

দিদিমা থলে থেকে সব খাবার বের করে টেবিলে রাখলেন। আর দাদু আপেল নিয়ে এলেন — ওগুলি ছিল ঘরের কোণে কাঠের একটি বাক্সে। এই জন্যই তো সারা ঘরে ছিল বাগানের মত সৌরভ।

— সময় মতই আমি এখানে এসেছি, — বলেন দাদু। — আপেল পড়তে শুরু করেছে।

দাদু চা খাচ্ছেন ধীরে ধীরে, খাচ্ছেন প্লেট থেকে। আর আলিওনা পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েই আছে। দাদু তা লক্ষ্য করে প্লেটটি টেবিলে রাখলেন ও তারপর হেসে ফেললেন:

— কী নাতিন, আমায় এবার চিনলি? — বলেই তিনি আলিওনাকে দিলেন ডাল ও পাতা সহ সবচেয়ে বড় আপেলটি।

চা খাওয়া শেষ। দিদিমা উঠে পড়লেন।

— এত তাড়াতাড়ি কোথায়? — অবাক হন দাদু।

— আমরা খড় শুকাতে যাচ্ছি।

— ও আচ্ছা... তাহলে খাবার নিয়ে যাও।

— আরে থাক, থাক! আলিওনার সঙ্গে তোমার জন্য আরও পাঠিয়ে দেব। — দিদিমা আয়নার সামনে গিয়ে তাড়াতাড়ি স্কার্ফটি বেঁধে নিলেন। তারপর তিনজনেই বেরিয়ে পড়ল।

আলিওনা ফিরে তাকাল বাগান ও ঘরের দিকে, এবং হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল: দরজার কাছে ছোট্ট একখানা তক্তা লাগানো রয়েছে, আর তাতে একটা সংখ্যা লেখা আছে। ঠিক তদ্রূপ, যেমনটি জেনিয়া বালুর উপর এঁকেছিল: যেন এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী শাদা পাখি।

— দিদিমা!

— তাড়াতাড়ি কর, আলিওনা।

— তোমাদের একটু এগিয়ে দিয়ে আসি, — বলেন দাদু। — আমি ওখানে বালতিতে আপেল ভরে রেখেছি।

— ও, ছোট দাদু, আমি তখন কী ভয়ই না পেয়েছিলাম! — স্মরণ করে আলিওনা।

— ভয়ের আবার কী আছে?

— কাল এগুলি যে ছিল না?

— গতকাল নাই বা ছিল, আগামী কাল তো থাকবে। তুই আমায় 'ছোট দাদু' বলে ডাকছিস যে? অথচ আমার চেয়ে বুড়ো কেউ নেই এই অঞ্চলে।

আলিওনা কোনকিছু বলে না। সে ভয়ে ভয়ে দাদুর হাত ধরে চলে। হাতটি তাঁর বড় ভাল।
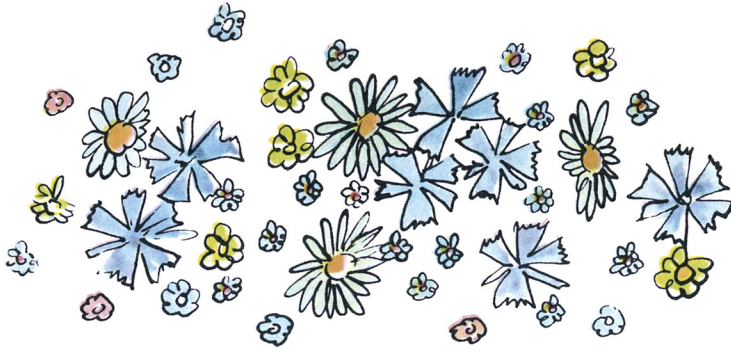
নবম অধ্যায়

খড়

দিদিমার সঙ্গে আলিওনা যাচ্ছে বুনো পথ দিয়ে, দু'ধারে প্রচুর লতাপাতা ঝোপঝাড়। হাতে তাদের আপেলের বালতি। শিগগিরই তারা মুড় ফিরে চলল ভেজা জলা পথ ধরে, পথটি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। কোন মতে তারা এসে পেঁছিল সেই জায়গাটিতে যেখানে রয়েছে ঘাসুড়েদের ঝুপড়ি। জেনিয়া হয়তো এই পথের কথা জানত না, তাই তো তারা কাল এত ঘোরাঘুরি করেছে। অথচ মাঠটি একেবারেই কাছে।

ঝুপড়ির কাছে মেয়েরা জড়ো হয়ে গেছে। আঁচড়াগুলি পড়ে আছে তাদের সামনেই। কে যেন দিদিমার সঙ্গে আলিওনাকে দেখে বলে উঠল:

— এই তো সহায় এসছে, এবার শুরু করা যায়!

আলিওনা চারিদিকে তাকায়: জেনিয়া নেই কোথাও। হয়তো চলে গেছে? তারপর মেয়েরা যখন একটু চুপ হল,. অদূরেই শোনা গেল:

খচ্! খচ্! খচ্!.. পাশেরই মাঠে ঘাস কাটা হচ্ছে।

— ঘাস-কাটা ভুলে যায় নি তো! — বলেন দিদিমা। — আজকাল সব কাজেই মেশিন আর মেশিন, আমাদের মরদদের তাকৎ খরচের জায়গাই নেই।

— মেশিন হলে মন্দ নয়, — সাড়া দেয় অন্যরা, — তবে আমাদের মাঠে মেশিনের যে জায়গাই হবে না।

— ঠিক আছে, মরদদের হাড়গোড় এবার একটু নড়বে।

— সত্যিই!

আলিওনার ভয়: মেয়েরা সব আঁচড়া নিয়ে নিলে সে কাজ করবে কী দিয়ে। তারা সবাই ভাল দেখে আঁচড়া বাছতে থাকে, বার বার বদলায়। আলিওনাও একটি তুলে নিল। আঁচড়ার হাতলটি শুকনো, সূর্যের তাপে গরম, বহু হাতে পড়ে একেবারে মসৃণ হয়ে গেছে, বেশ হালকাও।

একটা জায়গা বেছে নিয়ে আঁচড়া চালায় আলিওনা। ঘাসগুলি এখনও সবুজ ও ভারি।

— তুই কখনও খড় শুকিয়েছিস? — জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

— না!

— দেখ তাহলে।

দিদিমা আঁচড়ার দাঁত দিয়ে অনেকগুলি ঘাস তুলে নিয়ে তা ছড়িয়ে দিলেন ফাঁক ফাঁক করে।

— দেখলি তো? এইভাবে অল্প অল্প করে যাতে প্রতিটি ঘাসের উপর রোদ পড়তে পারে...

আঁচড়া তুলল আলিওনা। ঘাসের ওজনে ওটা ভারি। ঘাসগুলি ঝেড়ে ফেলল, আঁচড়া আবার খালি। তবে ঘাস স্তূপাকারেই রয়েছে। ওভাবে শুকাবে না।

— আয়, একসঙ্গে কাজ করি, — বলেন দিদিমা। — নিজের আঁচড়া রেখে আমারটা ধর।

একসঙ্গে বেশ ভালই চলল!

— এই তো খাসা উতরাচ্ছে। — তারিফ করেন দিদিমা।

— আমার অনেক বুদ্ধি আছে, তাই না দিদিমা?

— হ্যাঁ, এবার নিজের সারিতে যা।

আলিওনা গেল। কাজ ভালই চলল। মাঠের শেষ অবধি পৌঁছল, আর ওখানে মেয়েরা জড়ো হয়েছে।

— এই মাঠে কাজ শেষ, — বলে তারা, — এবার অন্যটায় যাওয়া যাক। — এবং আলিওনার প্রশংসা করে: — লক্ষ্মী মেয়ে তুই, আমাদের কত সাহায্য করছিস! ক্লান্ত হয়েছিস? আমাদের সঙ্গে আরও কাজ করবি?

আলিওনা খুশি।

— অবশ্যই করব! — এবং চলতে থাকে তাদের পেছন পেছন।

পরে ফিরে তাকাল। দেখে দিদিমা একা সামলাতে পারছেন না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন নিশ্চয়ই। হাত দিয়ে মুখ মুছছেন।

আলিওনার লজ্জা লাগল। কীভাবে সে চলে যেতে চাইছিল? প্রশংসা শুনে সবকিছু ভুলেই গিয়েছিল!

— তোমরা যাও, দিদিমা আর আমি তোমাদের নাগাল ধরব, — মেয়েদের বলে আলিওনা, সে এগিয়ে যায় দিদিমার দিকে।

দুপুর অবধি তারা কাজ করল।
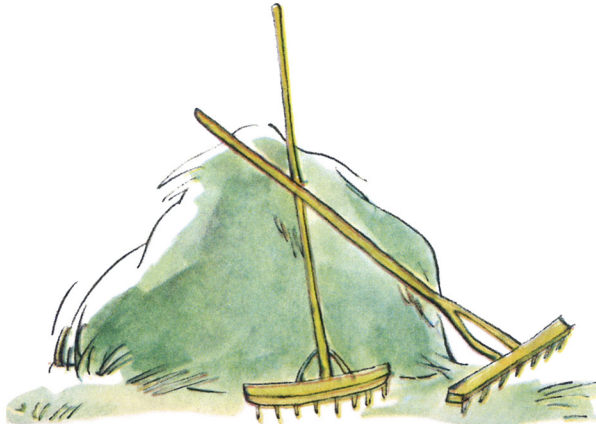
দশম অধ্যায়

গরম দিন

দিনটি ভীষণ গরম। লম্বা-হাতা জামা আর জুতো পরাতে বেজায় গরম লাগছে আলিওনার। তার উপর মাথায় আবার স্কার্ফ। আর মুখে গরম লাগছে সবচেয়ে বেশি।

আঁচড়া ভারী হয়ে উঠল, পিঠ যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

এমন সময় বনের মধ্যে ঝনঝন শব্দ শোনা গেল।

— খাবার এনেছি!.. — কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

অন্যান্যরা হয়তো জানে না — কে চেঁচাল, তবে আলিওনা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল: এটা জেনিয়ার গলা। ও দুপুরের খাবার নিয়ে এসেছে। তার মানে ঘোড়ার গাড়িতে এসেছে, একাই ঘোড়া চালিয়েছে।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে গেল ঝুপড়ির কাছে। ওখানে গাড়িতে খাবার রয়েছে। কী দেমাক জেনিয়ার! ঘোড়ার কাছে হাঁটাহাঁটি করছে, কখনও ওর গায়ে হাত বুলায়, আর কখনও ওকে খেতে দেয় গম। কিন্তু একটি বারও আলিওনার কাছে এল না। আলিওনাও গেল না তার কাছে। ঝুপড়ির পেছনে দিদিমার সঙ্গে বসল ছায়ায়। তারপর ঘাসের উপর শুয়ে পড়ে চোখ বুজে, তবে একটু-একটু তাকায়ও বৈকি। আকাশটি প্রায় শাদা — খুব গরমের সময় তাই হয়। গরম গালের কাছের ঘাসগুলি আকাশে উড়ে যেতে চায়। অনেক উপর দিয়ে উড়ে গেল একটি পাখি... আলিওনা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে তার মনে হল পৃথিবীটা যেন বদলে গেল, আকাশ নেমে এল নিচে, তাতে উড়ছে পাখি, আর কাছেই বালু — বেশ ছুটাছুটি লাফালাফি করা যায়। যেমনটি করা যায় নদীতে!

ছুটল আলিওনা। যেই জলে লাফ দিতে যাবে, অমনি জেনিয়া সলোমাতিন (এবং কোত্থেকে যে ও এল!) বলে উঠল:

'এখানে স্নান করবি না, এখানে ডওর'...

আলিওনা থমকে দাঁড়াল। ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

এখন আর তেমন গরম লাগছে না তার। ছায়ায় বেশ জিরিয়ে নিয়েছে সে। পাশে দিদিমা। মনে হচ্ছে তিনিও ঘুমিয়ে পড়েছেন। মাটিতে বাটিতে রয়েছে গমের জাউ। ঘুম নষ্ট করতে মেয়েদের কষ্ট হল, তাই খাবার রেখে দিয়ে নিজেরা কাজে লেগে যায়।

আলিওনা উঠে বসল। পিঠ সোজা করল সে।

কান পেতে থাকল। চারিদিক কী নিবর। শোনা যায় শুধু মৌমাছির গুণগুণ রব, ডালে ডালে পাখিদের চিড়িক-চিড়িক ডাক। গ্রামে এমন নিরবতা নেই। আর বাতাসে কিসের গন্ধ! খড়ও নয়, ঘাসও নয়, মধুও নয়। বাতাসে আরও কত ফলফুলের সৌরভ। আলিওনা ভাবল: 'দাদু বনে বেশ ভালই আছেন।'

কোন এক অজ্ঞাত আনন্দে হৃদয় ভরে উঠল আলিওনার। মনে পড়ল, দিদিমা দাদুকে বলেছিলেন:

'আলিওনার সঙ্গে তোমার জন্য আরও খাবার পাঠিয়ে দেব।'

এই জন্যই হয়তো আলিওনা আনন্দিত।
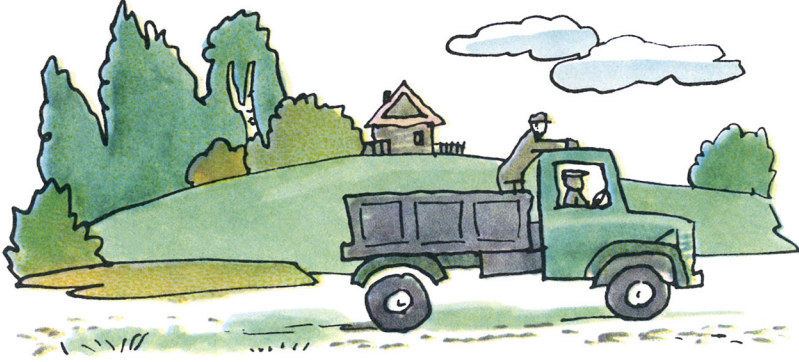
একাদশ অধ্যায়

বাবা

দিদিমা ও আলিওনা বকপুরে ফিরে এল। তারা এল ঘোড়ার গাড়িতে করে, কারণ দিদিমা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসে দেখে বাড়ির দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকল — কেউ নেই। কিন্তু যেই টেবিলে চোখ পড়ল, তারা তো একেবারে থ খেয়ে গেল: টেবিল সাজানো — তিনটি প্লেটে গরম সুপ, ভাপ উঠছে, রুটিও কেটে ফেলা হয়েছে... অথচ ঘরে কেউ নেই।

— খাবার নিজে থেকেই তৈরি হয়ে আছে, তাই না? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা। সে জানে যে এমনটি সম্ভব নয়, কিন্তু ভাবল — দিদিমার এখানে হয়তো সম্ভব!

দিদিমা টেবিলের কাছে বেঞ্চিতে বসলেন:

— উনুনের পেছনে কে লুকিয়ে আছ, বেরিয়ে এসো?

— আমি মোটেই লুকোচ্ছি না, — শুনতে পেল আলিওনা।

উনুনের পেছন থেকে বেরিয়ে এলেন... বাবা।

— বাবা!

বাবা পরিষ্কার স্যুট পরেছেন, শাদা শার্ট; হাত ধুয়ে এসে বলেন:

— ছোটবড় সবাই বসো, বোরকার জন্মোৎসব পালন করবো।

— কোথায় ও? — চারিদিকে তাকাতে লাগল আলিওনা। — কীভাবে পালন করবো?

বাবা ও দিদিমা হাসেন। বাবা বলেন:

— কীভাবে আর পালন করবো, সুপ খেয়ে!

বাবার হাসিখুশি মেজাজ। তিনি আজ খুব সুন্দর। বোরকার বিষয়ে কী বলছেন, বোঝা দায় — হয়তো তামাসা করছেন।

— নিউরা কেমন? — জিজ্ঞেস করেন দিদিমা।

আলিওনার কান খাড়া। নিউরা তার মা'র নাম।

— এক রকম, — বলেন বাবা। — ছোকরার দারুণ গলার জোর, একদম ঘুমোতে দেয় না।

— বা-মণি! — অনুরোধ জানায় আলিওনা। — আমি ওকে একটু দেখতে চাই।

— শিগগিরই দেখবি, — জবাব দেন বাবা।

টেবিলের তলা থেকে একটি বোতল বের করে তিনি তা থেকে কিছুটা মদ ঢাললেন নিজের ও দিদিমার গ্লাসে।

— ছোট্ট বোরকার মঙ্গল কামনা করি! — বলেন বাবা। — মানুষ হোক!

আলিওনা বাবাকে বলে:

— বা-মণি, দিদিমা খুব ভাল, তাই না?

— দিদিমা তোকে তাঁর জোয়ান বয়সের ফোটো দেখিয়েছেন? — জিজ্ঞেস করেন তিনি। — তখন খুব সুন্দরী ছিলেন।

— আর থাক বাবা... — আপত্তি করেন দিদিমা। — সে কথা মনে করে কী লাভ!

— আচ্ছা, দিদিমা, কখন তুমি জোয়ান ছিলে?

দিদিমা হেসে ফেলেন, জবাব দেন না।

— আর কী চমৎকার গান গাইতেন! — মাথা নাড়েন বাবা।

— দিদিমা এখনও গান, — অসন্তোষের সঙ্গে বলে আলিওনা। — নিজের গাইকে গান গেয়ে শুনান।

বাবা আলিওনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন:

— কপাল কুঁচকে বসে আছিস কেন?.. আরে তুই যে দেখছি ঝিমুচ্ছিস। ঠিক আছে, এবার তোমরা ঘুমোও! আমারও বাড়ি যাওয়ার সময় হয়েছে।

বাবা যখন চলে গেলেন, হঠাৎ আলিওনার চোখ পড়ল বেঞ্চিতে, তার উপর — ধোঁয়াটে কাগজের একটি মোড়ক।

— দিদিমা, ওটা আবার কী?

— তোর জন্য উপহার-টুপহার হবে আর কি।

— আর তোমার জন্য?

— আমার কী প্রয়োজন, আমি যে বুড়ো।

আলিওনার মুখ লাল হয়ে উঠল।

— 'কিন্তু তুমি তো জোয়ান ছিলে। না, এটা আমাদের দু'জনের জন্য! — বলেই আলিওনা মোড়কটি খুলে ফেলল।

আর ওতে ছিল শণের দু'খানা নরম স্কার্ফ। শণের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে! একখানা স্কার্ফ নীল, শাদা শাদা ফোঁটা তাতে। আর অপর স্কার্ফটি শাদা, তাতেও ফোঁটা, তবে ওগুলি নীল নীল।

— এটা তোমার জন্য, দিদিমা।

দিদিমারও স্কার্ফ হল। আলিওনার স্কার্ফটি নীল, আর দিদিমারটি — শাদা। স্কার্ফগুলি পরে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে তারা হেসে ফেলে। দিদিমা মাথা নাড়েন:

— সত্যিই তো বেশ জোয়ান-জোয়ান লাগছে!

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল তানিয়া মেয়েটি।

— আরে, তোর স্কার্ফটি কী সুন্দর, আলিওনা!

তবে পরে তার মনে পড়ল কী জন্য সে এসেছে।

— নমস্কার, এভদোকিয়া তিখোনোভনা! — বলে সে দিদিমাকে। — আমাদের বাড়িতে নুন শেষ হয়ে গেছে। আধ গ্লাস নুন দিন। পরে দিয়ে দেব।

— দে তো ওকে নুন, আলিওনা, — বলেন দিদিমা।

তানিয়ার কথাগুলি আলিওনার কেন যেন পছন্দ হল না: পরে দিয়ে দেবে। একটু নুন দিলে দিদিমার যেন কষ্টের সীমা থাকবে না!

আলিওনা আধ গ্লাসেরও বেশি নুন ঢেলে দিল।

— আলিওনা, — অনুরোধ করে তানিয়া, — তোর স্কার্ফটি একটু পরতে দিবি?

— ওটা বাবার উপহার, — জবাব দেয় আলিওনা।

— দিবি না?

আলিওনা চুপ থাকে। তানিয়া নুন নিয়ে রওয়ানা দিল। পরে দিদিমার দিকে ফিরে বলল:

— ধন্যবাদ, এভদোকিয়া তিখোনোভনা।

এবং দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

— দিদিমা, — জিজ্ঞেস করে আলিওনা, — ও সুন্দর?

— সুন্দর মেয়ে। ওদের সবাই সুন্দর, — জবাব দেন দিদিমা।

আলিওনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দিদিমার সঙ্গে বাসনপত্র ধুতে লাগল।

হঠাৎ দিদিমা একটু নুইয়ে পড়লেন, পিঠে হাত দিয়ে বলেন:

— না, আর পারি না, কী ব্যথা! — এবং সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন বিছানায়।

আলিওনা ছুটে যায়, তাঁকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয়:

— তুমি শুয়ে থাকো। আমিই বাসন ধুয়ে নেব।

— বাসন পড়ে থাকুক। তুই বরং আমার কাছে বোস্, বল কোনকিছু।

আলিওনা বসল, অনেকখন ভাবল, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না।

দিদিমা চোখ বুজলেন, যেন একটু তন্দ্রার ভাব এল। তখন আলিওনা ধীরে ধীরে বলতে লাগল:

— এক যে ছিল শাদা বক। জলায় ছিল তার একটি বাগান। আর বাগানে — বাড়ি। বাড়িটিতে সে রাখে শাদা এক পালক। একদিন একটি মেয়ে আসে ওখানে। যেই ও পালকটি হাতে নিল, অমনি তার পাখা গজিয়ে উঠল...

— কী, কী বললি? — বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেন দিদিমা। — তুই ভীষণ আস্তে আস্তে গল্প বলিস।

— ওটা কিছু না, আমি এমনিতেই, — সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে আলিওনা। — গল্প ভুলে গেছি। মনে পড়লেই আবার বলব।
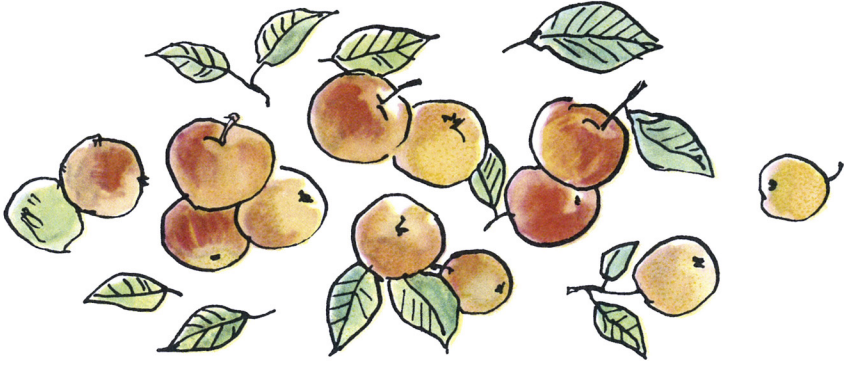
দ্বাদশ অধ্যায়

আপেল

সকালবেলা জেনিয়া সলোমাতিন নিজেই ছুটে এল। আলিওনা জানলা দিয়ে তাকায়, আর ও দেউড়িতে বসে আছে।

তাড়াহুড়ো করে কোনমতে হাতমুখ ধুয়ে গলায় স্কার্ফটি বেঁধে বেরিয়ে পড়ে আলিওনা। কিছুই খেল না সে।

জেনিয়া দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে তাকিয়েই থাকে তানিয়ার দিকে।

— একেই বলে স্কার্ফ!..

— সুন্দর?

— অবশ্যই...

আবার বসল, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

— ব্যস, খড়-কাটা শেষ। আমাকে একদমই কাটতে দেয় নি।

— আজ কী করা যায়? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— আমি... চলে যাচ্ছি...

— কী বললি, তুই গাঁয়ে চলে যাচ্ছিস?

— হ্যাঁ, দুপুরবেলা রওয়ানা দেব।

হঠাৎ এসে হাজির হল তানিয়া। আবারও সেন্ডেল আর লাল মোজা পরেছে। যেন ওর বাড়িতে কোন উৎসব হচ্ছে।

— তোরা এখানে বসে আছিস যে?

আলিওনার মেজাজ ভাল নয়। সে বলে:

— এমনিতেই।

তবে জেনিয়া খুশি। সে বলে:

— আজই চলে যাচ্ছি, তাই দেখা করতে এলাম।

— জানিস, এক কাজ করা যায়, — আলিওনাকে বলে তানিয়া। — চল জেনিয়াকে বিদায় দিতে যাওয়া যাক। যাওয়ার পথে দাদুর বাগানে ঢোকা যাবে। একেবারে পথের উপরেই। ওখানে কত আপেল! জেনিয়া পেড়ে দেবে।

জেনিয়া তো অবাক:

— কোন বাগান?

— ওই সেই বাগানটি, — কানে কানে বলে আলিওনা। — মনে আছে? বকের বাগান

— কোন বকের কথা বলছিস? — হেসে উঠে তানিয়া। — চল তাড়াতাড়ি, পরে বেশি গরম লাগবে।

— আমি যাব না, — বলে আলিওনা। — ওই বাগানে হাত দিতে নেই।

— কী যে বলিস? আমি বরাবর ওখানে আপেল পাড়ি।

— তোদের বাড়িতেই তো আপেল রয়েছে।

— পরেরগুলো খেতে বেশি ভাল লাগে!

— এই জন্যই তো সবকিছু ঘটেছে, — রাগ ক'রে বলে আলিওনা। — বড় ভাইয়ের লোভ ছিল পরের জিনিসে, আর তার জন্যেই শাদা বক যাদু থেকে মুক্তি পায় নি।

— তুই কী বকছিস? — অবাক হয় তানিয়া। — সব সময় বাজে কথা বলিস।

আলিওনা ভীষণ রেগে যায়:

— মোটেই বাজে কথা নয়। জেনিয়া নিজেই জানে...

তানিয়া জেনিয়ার দিকে তাকায়।

— ওটা গল্প... — বলে সে। ওরও হয়তো আপেল খাওয়ার ইচ্ছা আছে।

— তুই সবকিছুতেই বাধা দিস, — রাগের সঙ্গে বলে তানিয়া। — সব সময় কঞ্জুসি করিস।

— বাজে বকবি না কিন্তু! — ধমক দেয় আলিওনা। — ওটা যে আমার বাগান নয়।

— নাই বা হল। তুই কঞ্জুস। জেনিয়াকেই জিজ্ঞেস কর্ না। সত্যি বলছি না, জেনিয়া?

— সত্যি... — হঠাৎ বলে উঠে জেনিয়া।

আলিওনার মুখ খুলে গেল।

— বল, কখন আমি কঞ্জুসি করেছি?

জেনিয়া চুপ।

— বল, চুপ করে গেলি যে? আমি তোকে কী দিই নি? বল, নির্লজ্জ কোথাকার!

— আমাকে নয়... — টেনে টেনে বলে জেনিয়া। — আমাকে নয়। তানিয়াকে... তানিয়াকে তুই স্কার্ফ দিস নি।

— আ-চ্-ছা! — খেপে যায় আলিওনা। — তোর কাছে বেশ লাগিয়েছে তো! ঠিক আছে, যা তোরা আপেল চুরি করতে! যা না!

— যাবই তো! — জবাব দেয় তানিয়া।

জেনিয়াকে হাতে ধরে টানে তানিয়া। সেও মাথা নুইয়ে বেশ রওয়ানা দিল।

আলিওনা দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না: জেনিয়া গেল ওর সঙ্গে! স্বপ্নেও ভাবে নি ও এরকম ছেলে!

আলিওনা টেরই পায় নি কখন তার চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল নীল স্কার্ফে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাড়িঘর তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

এখন প্রায়ই বাবা বকপুরে আসেন। হয়তো আলিওনার জন্য তাঁর মন টানে, — তাই এত ঘন ঘন আসা যাওয়া করেন। এ ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল। বকপুর থেকে সমস্তকিছু মারিনো গ্রামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হল ফসল, আর তারপর শুরু হল বাড়িঘরগুলি ভাঙ্গা। সকালে আলিওনা ঘুম থেকে উঠে দেখে কোন কোন সারিতে এক-একটি বাড়ি নেই। ব্যাপারটি অনেকটা জেনিয়ার দাঁতের মত। ওর এক-একটি দাঁত পড়তে থাকে, আর তার জায়গায় উঠতে থাকে নতুন দাঁত। জেনিয়া নিজেই দেখিয়েছে, এবং এমনকি ছুঁতেও দিয়েছিল। কিন্তু বাড়িঘর — সে যে সম্পূর্ণই আলাদা ব্যাপার। বাড়িঘর তো আর মাটি থেকে গজাবে না। আলিওনা জানে — বাবাই তাকে বলেছেন — এখানে এখন বড় এক বাগান হবে।

তানিয়া মেয়েটিও মারিনোয় চলে যাবে।

একদিন সকালে সে দিদিমার ঘরে এল:

— নমস্কার এভদোকিয়া তিখোনোভনা! কেমন আছিস, আলিওনা, — এবং বড় একটি পুঁটলি টেনে এনে রাখল দরজার কাছে। — দিদিমা জিনিসগুলি এখানে এনে রাখতে বললেন।

— অবশ্যই, — মাথা নাড়েন দিদিমা। — আজ তোদের বাড়ি খুলবে? সাহায্য কর তো, আলিওনা।

আলিওনা গেল তানিয়ার পেছন পেছন, ওদের দেউড়িতে প্রথমে তার পা পড়ল।

ঘরে সমস্তকিছু উলট-পালট হয়ে আছে। লেপ, তোশক, বালিশ, কম্বল দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে খাটের উপর। দেয়াল থেকে ফোটোগুলি খুলে ফেলা হয়েছে, — ওয়াল-পেপারে তার পরিষ্কার চিহ্ন রয়েছে। দরজার কাছে রাখা হয়েছে ছোট ছোট পুঁটলি, বাক্স।

— সাহায্য করতে এসেছিস? — জিজ্ঞেস করেন তানিয়ার দিদিমা। তিনি সোজা ও লম্বা মহিলা, চোখগুলি কালো, ভুরুগুলিও কালো ও প্রশস্ত।

— তাহলে আপনারা এখন আমাদের বাড়িতে থাকবেন? — জিজ্ঞেস করে আলিওনা।

— ভগবানের ইচ্ছা, — কম কথায় উত্তর দেন তানিয়ার দিদিমা। — এই যে পুঁটলিটি ধর।

দুপুর অবধি আলিওনা আর তানিয়া জিনিসপত্র টানল। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে নি।

দুপুরের দিকে কয়েকজন লোক নিয়ে আলিওনার বাবা এলেন মারিনো থেকে। তানিয়াদের বাড়িটি খুলতে আরম্ভ করে তারা। প্রথমে ভেতরে ঢুকেন বাবা, জানলা থেকে কাচগুলি খুলেন তিনি।

— ধর তো তানিয়া। ওই ওখানে ঝোপের কাছে রাখ। ওকে সাহায্য কর তো, আলিওনা।

দেখতে দেখতে জানলাগুলি খুলে ফেলা হল। বাড়িটিকে আর বাড়ির মত দেখাচ্ছে না। ওতে এখন আর বাস করা যাবে না।

লোকগুলি ছাদ খুলতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সবই খোলা হয়ে গেল।

কড়িবরগাগুলি সযত্নে বাঁধা শুরু হল। আলিওনা হঠাৎ লক্ষ্য করল যে ওগুলিতে সবুজ রঙ দিয়ে নম্বর লেখা হয়েছে। পয়লা নম্বরটি সে সঙ্গে সঙ্গেই চিনে ফেলল — যেন ঠোঁটওয়ালা পাখি দাঁড়িয়ে আছে এক পায়ে। এই হল এক। পয়লা বরগা। আর সংখ্যা দুই — যেন পাখি মাটিতে বসে আছে। পরে —একটি পাখি উড়ে যাচ্ছে; এটা নিশ্চয়ই তিন। বাকি সংখ্যাগুলি আলিওনা পড়তে পারে না, ওগুলি তার জানা নেই।

দিদিমা সুপ রান্না ক'রে সবাইকে খেতে ডাকলেন।

খেতে বসল সবাই — বাবা, তাঁর সঙ্গের লোকেরা, দিদিমা তানিয়ার দিদিমা, আলিওনা। কেবল তানিয়াই বসল না, ও ঘোরাফেরা করছে নিজের জিনিসপত্রের কাছে। যেন কোনকিছু হারিয়ে ফেলেছে। আলিওনা ওর সঙ্গে একটি কথাও বলে নি। তানিয়াও তাই। শেষে ছোট্ট এক সুটকেস খুঁজে বের করল। ওটা উপরে রেখে খেতে বসল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার পর কড়িবরগা গাড়িতে তোলা শুরু হল।

— আমিও মারিনোয় যাব, — রাগের সঙ্গে বলেন তানিয়ার দিদিমা। — কোথায় কী ফেলবে তার কোন ঠিক নেই।

বসলেন তিনি কেবিনে আলিওনার বাবার কাছে এবং চলে গেলেন।

আর তানিয়া থেকে গেল আলিওনার দিদিমার সঙ্গে।

— মন খারাপ করিস না, — বলেন তাকে দিদিমা। — মারিনোয় ক্লাব আছে, শুনেছি ওখানে নাকি সিনেমা দেখানো হয়।

— আমি মন খারাপ করছি না, — বলে তানিয়া। সে ওই সুটকেসটি হাতে নিয়ে দিদিমার ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল: — আমি ওখানে ইশকুলে পড়ব। আর...

সুটকেসটি খুলল সে। তাতে পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে পুতুলগুলি: দাশা, এলভিরা, ন্যাংটা বোরকা। দাশা ও এলভিরা অন্তত জামা পরেছে, কিন্তু বোরকা একেবারেই ন্যাংটা। নিশ্চয়ই ওর ঠাণ্ডা লাগছে — হাজার হলেও শরৎকাল এখন। তার চোখগুলিও আর রাগীরাগী নয়।

— এখন আর পুতুল দিয়ে আমি কী করব? — বলে তানিয়া জানলা দিয়ে তাকাল।

আলিওনা চুপ।

— এগুলি কাউকে আমি দিয়ে দেব।

আলিওনা আবারও কোনকিছু বলে না।

— এলভিরা, দাশা, বোরকা — তিনটিই কাউকে দিয়ে দেব।

আলিওনা টেবিল মুছতে লাগল। তানিয়ার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই তার। ওর পুতুলেও তার প্রয়োজন নেই।

বাবা যখন আবার জিনিসপত্র নিতে এলেন, আলিওনা তাঁকে বলে:

— বা-মণি, আমাকে একটি দিনের জন্য নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। বোরকাকে দেখতে চাই।

বাবা বলেন:

— ঠিক আছে, নিয়ে যাব।

গাড়িটি বাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। আলিওনা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে বসল কেবিনে। তার ভয় হল পাছে বাবা তাকে নিয়ে যেতে ভুলে যান। দিদিমা থলিতে কিছু শশা আর আপেল দিলেন তাকে:

— নে, মাকে খেতে দিস।

বাবা বসলেন কেবিনে। মোটর গর্জে উঠল। তারপর তারা চলে গেল।

চতুর্দশ অধ্যায়

ছোট্ট পুতুল

আলিওনা যাচ্ছে গাড়িতে করে। যাচ্ছে বকপুরের মধ্য দিয়ে। বাড়িঘর প্রায় আর নেই। চোখে পড়ে শুধু ঝোপঝাড় আর আপেল গাছ। বিদায়, বিদায় বকপুর!..

আজই আলিওনা মাকে দেখবে।

...গাড়িটি যাচ্ছে কুয়োর পাশ দিয়ে...

আলিওনা মাকে দেখবে। ছোট ভাই বোরকাকেও। ও নিশ্চয়ই ছোট্ট একটি পুতুলের মত। চুলগুলি কোঁকড়া-কোঁকড়া, নীল-নীল চোখ! না, আলিওনার তর সইছে না!..

...যায় তারা বনের ধার দিয়ে, মাঠের পাশ দিয়ে, নদীর পারে পারে...

কতদিন আলিওনা মাকে দেখে নি। আর বোরকাকে সে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেবে, এবং তারা গ্রামে বেড়াতে যাবে। দেখে হিংসে হবে সবার। আর কতক্ষণ! আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়!..

এই তো মারিনো। নদীর তীর বরাবর ছড়িয়ে আছে বড় গ্রামটি। যেদিকে নদী — সে দিকেই গ্রাম।

নদীর ওপারে পলট্রি-ফার্ম। পথ থেকে ভাল দেখা যায়। ওখানে ঘোরাফেরা করছেন শাদা গাউন পরা কোন এক মহিলা। তাঁর চারিদিকে যেন হলদে-হলদে মেঘ, তবে আসলে তা মেঘ নয়, — হলদে-হলদে মোরগছানা। কে উনি? যদি মা হন?! আলিওনা বাবার হাত ধরল, যেন তিনি গাড়ি থামান। তারপর চেয়ে দেখল: উনি মা নন, নাদিয়া মাসি।

গ্রামটি বিরাট। আলিওনা সবকিছুই ভাল চেনে: রাস্তাঘাট, নদীর তীর, বাড়িগুলি।

গ্যারেজ। অনেকগুলি গাড়ি ওখানে। সকালে ওখান থেকে ভীষণ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে আসে ট্র্যাক্টর, জিপ আর বাবার ট্রাক... আর ট্রাকের পাদানীতে লাফালাফি করে ছেলেপুলেরা, জেনিয়া সলোমাতিন... বাবা ওদের বলেন:

'নাম পাজি সব!'

ব্যস, বাড়ি পেঁছিা গেল। জানলার ধারে বেঞ্চি। ঘুরে বেড়াচ্ছে মুরগিগুলো। ছানাগুলি বেশ বড় হয়ে গেছে, ওগুলি এখন অনেকটা দিদিমার মুরগিছানার মত: ছটপটে, ঝগড়াটে... এ ছাড়া আর বাকি সবকিছুই আগের মত। যেন কিছুই বদলায় নি। কিন্তু আলিওনার তো সব ব্যাপার জানাই আছে!

— বা-মণি, দরজাটি খুলো না! তাড়াতাড়ি খুলো।

দেউড়িতে এসে দাঁড়ালেন মা।

— মা! মা-মণি! — এবং আলিওনা মা'র গলা ধরে ঝুলে পড়ল।

— আমার লক্ষ্মী সোনা ফিরে এসেছে, — বলেন মা। — দিদিমার আদর পেয়ে — আমার কথা তোর একেবারে মনেই ছিল না...

— বাঃ, তুমি কী বলছ!.. জানো মা-মণি, আমাদের দিদিমা কী ভাল লোক। আচ্ছা মা-মণি, বোরকা কোথায়?

— আয় মা, দেখবি তো চল।

গেল তারা ঘরে। জানলার নিচে, এক কোণায়, দোলন-খাট। বাবা এটা বানিয়েছিলেন যখন আলিওনা হয়েছিল। উপরে ছোট্ট এক মশারি লাগানো — মশামাছি যাতে ওকে কষ্ট না দেয়। মা মশারিটি একটু তুললেন, আর ওখানে... ছোট্ট একটি পোঁটলা, শাদা কাপড় দিয়ে মোড়া। মুখটি কেবল দেখা যাচ্ছে। তা গোলাপী। কচি নাক। মুখটি ছিদ্রের মত। আর চোখগুলি বন্ধ। শ্বাস ফেলছে তো ফেলছেই। আর টুপীর ভেতর থেকে কচি-কচি ক'টি চুল বেরিয়ে এসেছে।

আলিওনার ইচ্ছে হল ওকে ছোঁয়, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

— বোরকা! তুই জানিস, আমি তোকে দেখতে এসেছি বকপুর থেকে?

আলিওনা হাতের তালু দিয়ে সাবধানে স্পর্শ করল ভাইয়ের কপাল — ঠিক সেই জায়গায় যেখানে টুপীর ভেতর থেকে চুল বেরিয়ে এসেছে। চুলগুলি উষ্ণ ও নরম।

আর বোরকার মুখ একেবারে লাল, যেন রাগ করেছে; কপাল কুঁচকালো এবং খুব ধীরে ধীরে একটু চেঁচিয়ে উঠল। ঈশ, কী দেমাক, ছোঁয়াও যায় না!

আলিওনা তাকে আদর করতে চায়, বোনের মত। আর ও?!

মাকে খুব আনন্দিত মনে হল। তিনি বোরকাকে সাবধানে তুলে নিলেন:

— কাঁদিস না বাবা, কাঁদতে নেই...

আর আলিওনার দিকে তাকালেনই না।

আলিওনা বাইরের দিকে ছুটে যায়। বার-বারান্দায় বেঞ্চিতে ধাক্কা খায়। পায়ে ব্যথা পেয়ে কেঁদে ফেলে।

— কী হয়েছে মা? — বাবা তার মুখ তুলে ভেজা চোখের দিকে তাকালেন। — কী হল?

— পায়ে লেগেছে।

— দেখা তো! ফুঁ দিলেই সেরে যাবে।

বাবা আলিওনার পায়ে ফুঁ দিলেন, তারপর জিজ্ঞেস করেন:

— বোরকাকে কেমন দেখলি?

— বা-মণি... — বলে আলিওনা চোখ ফিরিয়ে নেয়। — বা-মণি, এবার আমরা কী করব?

— কী হয়েছে?

— আমাকে বোরকার মোটেই পছন্দ হয় নি।

বাবা হেসে উঠে আলিওনাকে তুলে নিয়ে গেলেন দেউড়িতে। তাকে নিয়ে ছুড়াছুড়ি করলেন, যেন ফেলে দেবেন আর কি। পরে যেন ধরে ফেলে বলেন:

— ঠিক এইভাবে আমরা ওকে ফেলে দেব!

— না বা-মণি, ও থাকুক।

— বনে নেকড়েদের কাছে ফেলে আসব।

তানিয়ার কথা মনে পড়ল আলিওনার।

— না, বোরকাকে নেকড়ের কাছে নিয়ে যেতে দেব না।

বাবা আবার হেসে উঠলেন। দেউড়িতে বসে হাঁটুর উপর বসালেন আলিওনাকে।

— ঠিক আছে মা, তুই মিছে অত চিন্তা করিস না। আমাদের বোরকা বড় হয়ে উঠবে, তাকে নিয়ে বেড়াতে যাবি — তোর সখীদের তখন কী হিংসে হবে!

— সত্যিই বলছ বা-মণি? ও আমাকে দিদি বলে ডাকবে?

— নিশ্চয়ই, আমি কি মিথ্যা বলব? ও বড় হলে তোর জন্য সবকিছু করবে। নিজেই দেখবি।

আলিওনা চোখ মুছে নিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ঘরে ছুটে যায়। বোরকা তখন মশারির নিচে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আর মা রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত।

আলিওনা দোলন-খাটের কাছে গিয়ে মশারিটি একটু তুলে তাকাল ছোট ভাইটির দিকে:

— ঠিক আছে, বড় হয়ে উঠ্। তাড়াতাড়ি!

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাড়িতে

আগে মা কাজ করতেন পলট্রি-ফার্মে, তখন তার মোটেই সময় হত না। আর এখন মা বাড়িতে, কিন্তু হলে হবে কী। সেই আবার সময় নেই। আলিওনা মাকে বলে:

— মা-মণি, তুমি গল্প বলতে পার?

আর মা বলেন:

— পারি আলিওনা। আচ্ছা যা তো, একখানা পরিষ্কার কাঁথা নিয়ে আয়, ওই যে ওখানে বেড়ার উপর শুকাচ্ছে।

সারাক্ষণ মা বোরকাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাকে খাওয়ান-শোয়ান। আলিওনা ফের বলে:

— মা-মণি, তুমিও বকপুরী?

— অবশ্যই। যা মা, আলু তুলতে যা এবার। কোদাল কোথায় রয়েছে জানিস?

আর নিজে বোরকার কাঁথা নিয়ে চলে যান নদীতে — ধুতে হবে তো।

আলিওনা মাকে দিদিমার কথা বলতে চায়। কী চমৎকার দিদিমা তার! আর দাদুর কথাও। কিন্তু মা'র সময়ই নেই।

— একটু সবুর কর, — বলেন মা, — দিদিমা শিগগিরই আমাদের মারিনোয় চলে আসবেন, আবার তোমরা একসঙ্গে বেড়াতে পারবে।

আলিওনা অবাক হয়:

— আর আমি? আমি তাহলে আর বকপুরে যাব না?

— কোথায় আর যাবি? ওখানে গ্রাম আর নেই। সব বাড়ি খুলে আমাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে... আচ্ছা এবার বোরকার কড়াটা ধুয়ে আন তো।

আলিওনা উঠোনে বসে বালু দিয়ে কড়াটি ঘষে, আর পথের দিকে তাকায় — বাবার অপেক্ষা করছে। সত্যিই কি সে আর দিদিমার গ্রামে যাবে না? চলে আসার সময় আলিওনা দাদুর সঙ্গেও দেখা করে নি।

সন্ধ্যের দিকে বাবা ফিরলেন। ঘরে ঢুকে বলেন:

— আলিওনা কোথায়?

— আমি এখানে বা-মণি।

— নে তোর জিনিসপত্তর, আর এটা দিদিমার উপহার।

— আর দিদিমা?

— দিদিমা আমাদের এখানে আসছেন না, মা। বলেন, 'আপাতত এখানে থাকবো, পরে না হয় দেখা যাবে।

— একা থাকবেন কী করে? — মা বিস্মিত হন। — সবাই যে চলে এসছে।

— কড়িবরগা সবকিছু দাদুর ওখানে নিয়ে যেতে বললেন। ওখানেই আরেকটি ঘর করবেন। ভয়ের কোন কারণ নেই। তাছাড়া তাঁরা একটি ছোকরাও পাচ্ছেন — বাগান দেখাশুনা করবে। থাকবেন বাগানে।

শাদা কাপড় দিয়ে মোড়া উপহারটি খুলল আলিওনা।

কেক। আপেল। আপেলটি বিরাট। আর আলাদা এক মোড়কে সবকিছু রয়েছে অল্প অল্প — চেরি, প্লাম, ক্যারাণ্ট, গুজবেরি...

সে জানে, কেন দিদিমা এই সমস্তকিছু পাঠিয়েছেন।

কিন্তু আলিওনা এখন যদিও মারিনোয় আছে, তার মন পড়ে রয়েছে সেই রূপকথার বাগানে। ওখানে আছে আলো আর ছায়া, ঘাসের মধ্যে পড়ে রয়েছে আপেল, আর মাথা তুললেই — ডালে ডালে প্রচুর চেরি...

হঠাৎ বাবা বুক পকেট থেকে চেপ্টা কী একটি জিনিস বের করলেন, পত্রিকার কাগজ দিয়ে মোড়া।

— আর এটা সামলে রাখিস... — বলেন বাবা! — দিদিমার হাতে এ রকম ফোটো কেবল একটাই।

আলিওনা জানলার কাছে গিয়ে সাবধানে কাগজটি খুলল। হঠাৎ তার মধ্যে শুরু হল ঘন ঘন হৃৎস্পন্দন... দীঘির ধারে চেয়ারে বসে আছে লম্বা শাদা পোশাক পরা এক মেয়ে। চারিদিকে কত গাছপালা আর ফুল। চুল খোলা, হাত রয়েছে লম্বা শাদা আস্তিনে, একটু পেছনে সরানো, যেন পাখির ডানা আর কি। চোখগুলি বেশ বড় বড়, রূপকথার রাজকন্যার যেমন হয় ঠিক তেমনি।

— ইনি কে? — ফিসফিস ক'রে জিজ্ঞেস করে আলিওনা। কিন্তু কেউ তাকে শুনতে পায় নি। সেও আর জিজ্ঞেস করল না, কারণ বার বার জিজ্ঞেস করলে রূপকথার মজা চলে যায়। তাছাড়া সে নিজেই জানে কে ইনি।

আলিওনা ফোটোটি লুকিয়ে রাখে বালিশের তলায়। ভেবেচিন্তে আপেলও লুকিয়ে ফেলল। তারপর চুপিচুপি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের শেষ অবধি গিয়ে মাঠের দিকে চলল।

— কোথায় চলেছিস, আলিওনা?.. — শুনতে পেল জেনিয়ার গলা।

শুয়োরছানার জন্য ঘাস নিয়ে যাচ্ছে জেনিয়া। আলিওনার কাছে এসে ঝুড়িটি মাটিতে রাখল সে।

— আমার উপর তুই রাগ করিস না, আলিওনা... সেদিন আমরা আপেল চুরি করি নি। দাদু নিজেই আমাদের এক থলে আপেল দেন।

আলিওনা সাড়া দেয় না। ওর সঙ্গে কী-ই বলার আছে! ব্যাপার আপেলে নয়। সে পরিষ্কার কল্পনা করল তানিয়ার সেন্ডেল ও লাল মোজা, আর তার পাশে — জেনিয়ার খালি পা। যে হাত বাড়ায় তার সঙ্গেই যায় এই জেনিয়া।

— কথা বলছিস না যে?.. — জিজ্ঞেস করে জেনিয়া।

— বলছি তো, — গরগর করে আলিওনা।

সে বুক ভরে নিল বিকালের বাতাস, উপরের দিকে তাকাল, অস্তগামী সূর্যের আলোয় মেঘ তখন গোলাপী।

— আমি তাহলে চললাম, জেনিয়া।

হঠাৎ আলিওনার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক চমৎকার দৃশ্য: মাঠের উপর দিয়ে সগর্বে গলা লম্বা করে শাদা প্রশস্ত পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে এক পাখি। উপরে উঠতে উঠতে লাল লম্বা পাগুলি লুকিয়ে ফেলল পাখিটি, তারপর দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল, — চলে গেল মাঠ, বন আর জলার আড়ালে... উড়ছে সে বকপুরের দিকে, সেই জলা, বাগান আর বনের দিকে:

সুন্দর আমার শাদা পাখি,
তোর পথপানে চেয়ে থাকি...

বাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে মাটির দিকে নেমে আসছে একটি পালক।

জেনিয়া আর আলিওনা ছুটল ওটা ধরতে। কিন্তু পালকটি যেন ঠিক আলিওনাকেই বেছে নিল — এসে পড়ল তারই হাতে।

পালকটি অপূর্ব — শাদা, লম্বা ও মসৃণ, নিচের স্বচ্ছ ভাগটি এখনও উষ্ণ।

— এটা আমাদের দু'জনের! — চেঁচায় জেনিয়া।

— না জেনিয়া, আমি যে কঞ্জুস।

জেনিয়া মাথা নিচু করে ফেলে।

— না, তুই মোটেই কঞ্জুস নস... ব্যাট বল খেলতে আসবি আমাদের বাড়িতে?

— হয়তো আসতে পারি, — জবাব দেয় আলিওনা। তারপর সাবধানে পালকটি নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আলিওনা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। পালকটি রাখল বালিশের নিচে — ওখানে আপেল আর ফোটোও রয়েছে। এবং হঠাৎ কেঁদে ফেলে।

— তোর কী হল, মা? — জিজ্ঞেস করেন বাবা। কাছে এসে তিনি হাত বুলিয়ে দেন আলিওনার মাথায়। — কেউ তোকে কোনকিছু বলেছে?

— না। মন খারাপ আমার।

— কেন?

আলিওনা নিজেই জানে না কী হয়েছে। কেবল জানে যে মন খারাপ।

— আমাকে ছাড়া দিদিমা কেমন আছেন জানি না।

— আর তুই তাঁকে চিঠি লিখ না। আমি গিয়ে দিয়ে আসব।

ষোড়শ অধ্যায়

চিঠি

সন্ধ্যায় আলিওনা মা'র কাছ থেকে কাগজ আর রঙীন পেন্সিল নিয়ে চিঠি লিখতে বসল।

আলিওনা এখনও অক্ষর চেনে না, শুধু দু'একটি সংখ্যাই জানে। তবে সে কোন সমস্যা নয়। সব অসুবিধা সত্ত্বেও চিঠিখানা কিন্তু চমৎকার হল।

প্রিয় দিদিমা,

আলিওনা আঁকল লাল আর হলদে আপেল, ওগুলো ডালে ডালে ঝুলছে। আপেলগুলি রসাল আর সুগন্ধযুক্ত। আরও আঁকল চেরি, লাল লাল র‍্যাজবেরি।

তোমার জন্য বোরকা ও আমার ভীষণ মন টানছে।

আলিওনা বোরকাকে আঁকল। ও ছোট্ট, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, আলিওনার হাত ধরে রয়েছে।

দাদুকে আমাদের নমস্কার জানাবে।

এবার আঁকল দাড়িওয়ালা দাদুর ছবি।

আঁকল বড় একটি বাগান।

আরও একটি আপেল।

আজ এখানে শেষ করছি, দিদিমা।

এরপর আলিওনা নিজেই জানে না কীভাবে এ'কে ফেলল খুব সুন্দর একটি শাদা পাখি। পাখিটি লম্বা ঠেংয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে বাগানের মাঝখানে, আর তার শাদা পাখাগুলি একটু পেছনে।

প্রণাম নিও।

তোমার আদরের আলিওনা।

কাগজে আর জায়গাই থাকল না, তাই আদরের আলিওনার ছবি আঁকতে হল একটা কোণাতে।

আলিওনা চিঠিখানি বাবাকে দিয়ে দিল। বাবা ওটা খামের মধ্যে ভরে আটা দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। তারপর লিখলেন ঠিকানা:

বকপুর গ্রাম, বাড়ি নং ১।

দিদিমা চিঠি পেয়েই বুঝতে পারবেন যে আলিওনা শিগগিরই আবার তাঁর কাছে আসবে।

আমার
কাপ্তেন
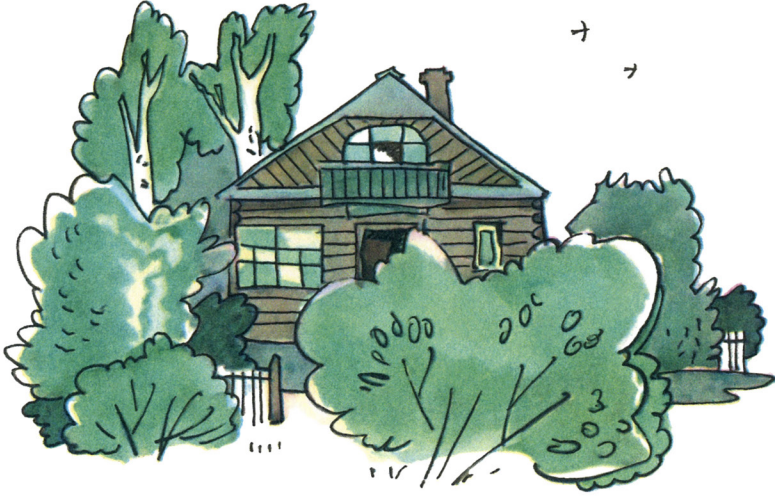
কাঠের পেঁচা

বাড়ির বাসিন্দারা হল: নিনা ইগোরেভনা, কাঠের এক পেঁচা, হর্তাকর্তা মিন্‌সে লেকা, আর হরির খুড়ো বোরিয়া যাকে লোকে কাকু বলে ডাকতেই বেশি পছন্দ করে। তবে এটা ঠিক যে কখনই তার দেখা পাওয়া যায় না।

আর এখন বাড়িতে এসেছে নতুন এক বাসিন্দা — পেতিয়া বলে একটি ছেলে। মা মাস খানেকের জন্য কোথাও চলে গেছেন, তাই পেতিয়াকে রেখে গেছেন নিনা ইগোরেভনার কাছে। নিনা ইগোরেভনা তার দিদিমা নন, কেননা তিনি তার মা'র মা নন, কেবল সৎ-মা।

নিনা ইগোরেভনা ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বলেন:

— হর্তাকর্তা মিন্‌সে, আবার রান্নাঘরটিতে ভাল করে ঝাড়ু দাও নি!

আর যদি লক্ষ্য করেন যে গত সন্ধ্যায় বোরিয়া কাকু চৌকাঠের কাছে জুতো খুলে নি (ওখানে সবার জন্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের চটি), তাহলে রাগে গরগর করেন এবং শুনিয়ে শুনিয়ে বলেন:

— ধুলোবালি ঝেড়ে ঘরে ঢুকতে পারে না। এমনিতেই হরির খুড়ো, তার উপর আবার মেঝেও নোংরা করবে।

নিনা ইগোরেভনার কাছে কেউ বেড়াতে এলে, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পেতিয়াকে ডেকে এনে অতিথির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেন:

— এই সেই ছেলেটি যার কথা আমি আপনাকে বলেছিলাম। ছোকরাটি কোন কাজের নয়। একেবারে নীরস ও নোংরা। কানে ময়লা, নখগুলি ভীষণ কালো কালো। আমি চাই যে ওকে আপনার পছন্দ হোক।

নিনা ইগোরেভনার বাড়ির পেছনে আছে বাগান। পয়লা সারিতে স্ট্র-বেরি, আর তারপর — আপেল গাছ, তবে গাছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আরও রয়েছে প্লামগাছ — ওগুলোর ডালে ডালে যেন ছোট্ট কালো কালো পাখিরা বসে আছে। কিন্তু ওগুলি পাখি নয় — কেবল দূর থেকে তা মনে হয়। ওগুলি প্লাম।

— দেখছিস, কী চমৎকার বাগান? — প্রথম দিন বলেন নিনা ইগোরেভনা। — আন্তনোভ্‌কা আপেল, ভিক্তরিয়া স্ট্র-বেরি... যে এখানে ঢুকবে, সে-ই মজাটা বুঝবে।

ভারি তো, নিনা ইগোরেভনা ছন্দ মিলিয়েও কথা বলতে পারেন!

যে এখানে ঢুকবে,
সে-ই মজাটা বুঝবে!

— কী করে মজাটা বুঝবে? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— মা তোকে শিক্ষা দিয়েছে কীভাবে? পেটি মেরে?

এ রকম কথাবার্তা পেতিয়ার পছন্দ হল না।

— মা দড়ি-লাফ শিখিয়েছেন, — বলে সে।

মা'র সঙ্গে সে কত ছুটাছুটি করেছে, তীরধনুক নিয়ে খেলেছে। কিন্তু এসব কথা বলার প্রয়োজন নেই।

— দড়ি তো আর পেটি নয়, — বলেন নিনা ইগোরেভনা। — তবে তা দিয়েও চলবে।

প্রথম রাত্রে অনেকখন পেতিয়ার ঘুম এল না, নিনা ইগোরেভনা জানলার পর্দাটি টেনে দিয়ে বলেন:

— ঘুমা তো। কথা না শুনলে দেয়াল থেকে পেঁচা উড়ে এসে ঠোকর দেবে।

পেতিয়া এই কাঠের পেঁচাটির দিকে তাকাল। আর পেঁচাও তাকিয়ে রইল তার দিকে। বেড়ালের মতই জ্বল-জ্বল করছে পেঁচার চোখদুটি।

পেতিয়া চিন্তিত হয়ে পড়ল। যদি পেঁচা দেয়াল থেকে উড়ে এসে ঠোকর মারে তাহলে কারই বা ভাল লাগবে!

সে ভাবল, লেপের তলা থেকে বেরিয়ে খালি পায়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে পেঁচাটিকে আলমারির পেছনে ফেলে দিলেই ভাল হবে।

পেতিয়া তা-ই করল: গরম লেপের তলা থেকে পা বের করল, তারপর লেপটি ছুঁড়ে দিয়ে খাট থেকে নেমে ছুটে গেল ঠাণ্ডা মেঝের উপর দিয়ে।

পেঁচাটি তাকিয়েই রইল, উড়ল না। তখন পেতিয়া ওটাকে পেরেক থেকে খুলে উল্টো দিকে মুখ করে রাখল। ব্যস, পেঁচাও আর তাকাল না তার দিকে। তারপর অনায়াসে ফেলে দিল আলমারির পেছনে। পেঁচার পড়ার শব্দ হল। পেতিয়া তাড়াতাড়ি ছুটল বিছানায়, এদিকে ঠাণ্ডায় তার পাও জমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লেপ দিয়ে মুড়ে ফেলল নিজেকে।

আলমারির পেছনে পেঁচাটি কী করছে — জানা নেই, তাতে বরং খারাপ হল। পেঁচাটি একেবারে না থাকলেই ভাল ছিল; কিন্তু ওটা তো হাজার হলেও রয়েছে। জানলা খুলে বাইরে ফেলে দিতে হবে।

পেতিয়া লেপ সরাল। বাইরে অন্ধকার। জানলা খোলার ইচ্ছে ছিল না তার, কিন্তু খুলতেই হল।

মেঝে আর তেমন ঠাণ্ডা ছিল না, কারণ লেপের তলায় পেতিয়া নিজেকে গরম করে নিয়েছিল।

সে ছুটে গেল আলমারি অবধি।

হাত ঢুকাল আলমারির পেছনে।

পেঁচা নেই ওখানে।

সে কী?

আরও ভেতরে হাত ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করল। কিন্তু নেই।

সে হাত প্রায় বের করে ফেলেছে আলমারির পেছন থেকে, এমন সময় হঠাৎ ঠাণ্ডা কিছু একটা লাগল হাতে। পেতিয়া ভয়ে দেয় এক লাফ! পরে বুঝতে পারল: এটা যে পেঁচার চোখ! কাচের চোখ, আসল নয়।

পেতিয়া পেঁচাটিকে বের করল। ওটা একটা খেলনা। কাঠের পাখাগুলি ভীষণ অমসৃণ। তবে ফেলে দিতে ইচ্ছে হল না পেতিয়ার। ওটাকে বরং পোষ মানানো যাক।

সে ঢুকল লেপের তলায়। পেঁচাকে শোয়াল নিজের কাছে। ওটা আবার তাকাচ্ছে তার দিকে। চোখগুলি জ্বল-জ্বল করছে, বেড়ালের মত। পেতিয়া বলল পেঁচাকে:

— এই তুই পুঁচকে পেঁচা, মারামারি করিস না আমার সঙ্গে।

আরও বলল:

— পুঁচকে পেঁচা, চল আমরা দু'জনে দোস্তি করি। রাজী?

পেঁচা রাজী।

এমন সময় দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকলেন নিনা ইগোরেভনা।

— তুই ঘুমুচ্ছিস না কেন? — বললেন তিনি। — তুই যে দেখছি নিশাচর!

পেতিয়া কোন জবাব দেয় না। নিজেই জানে না কেন সে নিশাচর।

— পেঁচার ঠোকর খেলেই বুঝবি... — বলেন নিনা ইগোরেভনা।

আর পেতিয়া লেপের তলায় পেঁচাটির গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে একটু হাসল: পেঁচা যে এখন পোষ-মানানো।
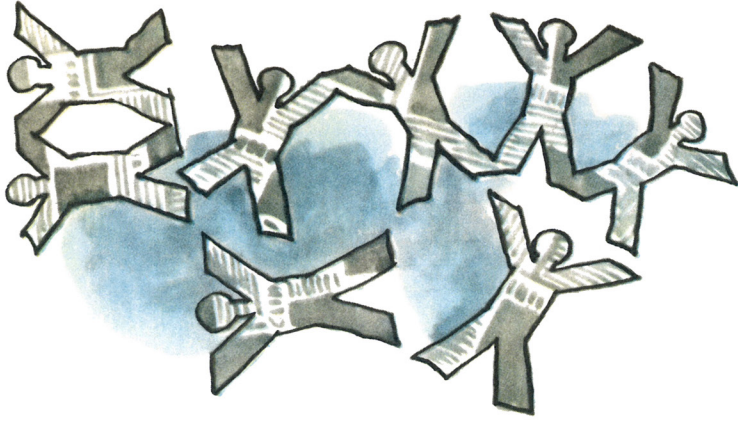
কাগজের মানুষ

নিনা ইগোরেভনা যখন বাড়িতে থাকেন না, শোনা যায় হিসাব-যন্ত্রের খটখট শব্দ। হর্তাকর্তা মিন্‌সে এই ভাবে হিসেব করেন। নিনা ইগোরেভনা সইতে পারেন না এই খটখট শব্দ।

— পেন্সনভোগী অ্যাকাউন্টেন্ট। — বলেন তিনি। — তুমি যদি পেন্সনভোগী তূরীবাদক কিংবা ঢাকী হতে তাহলে আমরা কী করতাম?!

আজ নিনা ইগোরেভনা বাড়িতে নেই। পেতিয়া এ-ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে, কারণ বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে।

যে-ঘর থেকে হিসেব করার শব্দ আসছে তার দরজাটি সামান্য খুলল পেতিয়া, হর্তাকর্তা মিনসে বসে আছেন টেবিলের ধারে। কী সব কাগজ দেখছেন আর খটখট করেই চলেছেন তিনি। খট্ খট্ খট্! পেতিয়ার কিছুই করার নেই। সে জানে না কী বলে ডাকবে ভদ্রলোককে: হর্তাকর্তা মিনসে কিংবা লেকা?

পেতিয়া দরজায় ক্যাঁচক্যাঁচ করে। হর্তাকর্তা মিনসে তাকান তার দিকে। ভদ্রলোকের মুখটি বেশ গোলগাল।

— আমার কিছুই করার নেই, — বলে পেতিয়া।

হর্তাকর্তা মিনসে তার দিকে তাকান আর কী যেন চিবাতে থাকেন। আগে পেতিয়া ভাবত তিনি হয়তো মিষ্টি কোনকিছু চিবুচ্ছেন। কিন্তু এখন সে জানে যে তাঁকে কেউ এত মিষ্টি খেতে দেয় নি। এমনিতেই চিবুচ্ছেন, মুখে কিছুই নেই।

— আয় এদিকে। তোকে খেলনা তৈরি করে দিচ্ছি। চমৎকার খেলনা ওটা।

হর্তাকর্তা মিনসে নিলেন পত্রিকার কাগজ আর কাঁচি। কাগজটি কয়েক বার ভাঁজ করলেন, যাতে বেশ মোটা হয়। পরে কাঁচি দিয়ে কাটেন উপর থেকে।

প্রথমে কাটেন গোল করে: এটা মাথা।

পরে সরু করে: এটা গলা।

তারপর লম্বা করে: এগুলি ধড় আর পা।

সব শেষে, একেবারে সরু করে: এগুলি হাত।

— এক — দুই — তিন! — বলেন তিনি এবং চিবানো বন্ধ হয়ে যায়।

ঠিক তখনই পড়ে যায় কাঁচি। কাঁচি তিনি তুলছেন না এবং রাগ করেন পেতিয়ার উপর।

— থাক, থাক! পড়ে থাকুক! তুই বরং দেখ কী বানিয়েছি আমরা।

ভাঁজ খুললেন।

দেখা গেল অনেকগুলি কাগজের মানুষ। একে অন্যের হাত ধরে আছে, এবং পাগুলিও তাদের জোড়া।

— কেমন?! — হর্তাকর্তা মিনসে খুব খুশি। — দেখলি তো? এবার যা মন ভরে খেল গে। ছেলেবেলায় আমি ওগুলো নিয়ে অনেক খেলেছি।

পেতিয়া তুলে নিল এই কাগজের মানুষগুলিকে। দেখতে ওগুলি এক রকম। অনেকটা নতুন বছরের ফারগাছ সাজানোর মালার মত ঝুলছে।

একবার — তা অনেকদিন আগের কথা, তখন ছিল শীতকাল — পেতিয়া দেখেছিল, মা কীভাবে নতুন বছরের ফারগাছ সাজাচ্ছিলেন।

মা ভেবেছিলেন, পেতিয়া ঘুমাচ্ছে। কিন্তু আসলে সে ঘুমায় নি — লেপের তলা থেকে ফাঁক দিয়ে দেখছিল।

— কী রে, তোর পছন্দ হয় নি? — অবাক হন হর্তাকর্তা মিনসে।

— না, চমৎকার হয়েছে, — বলে পেতিয়া। সে শুধু জানতে চায়, কীভাবে ওগুলি দিয়ে খেলতে হয়।

— তাহলে, এবার যা খেল গে, — বলেন হর্তাকর্তা মিনসে।

হিসাব-যন্ত্রটি টেবিলে পড়ে আছে।

শোনা গেল কীভাবে দরজা বন্ধ করছেন এবং বার-বারান্দায় কোট ঝাড়ছেন নিনা ইগোরেভনা।

পেতিয়া তাড়াতাড়ি ছুটে যায় টেবিলে:

— আর আমাকে একটু খটখট করতে দেবেন?

হর্তাকর্তা মিনসে হাত রাখলেন তার কাঁধে। পেতিয়ার মনে হল হাতটি যেন কাঠের।

— আমার হিসাব-যন্ত্রটি কখনও ধরবি না, — বলেন তিনি ধীরে ধীরে ও আস্তে আস্তে।

কিন্তু নিনা ইগোরেভনা সবকিছু শুনতে পাচ্ছেন।

— বাচ্চাটিকে ভয় দেখিও না! — বলেন তিনি দরজার ও-পাশ থেকে। — এমনিতেই ও ডরপোক।

পেতিয়া সাবধানে ভাঁজ করে কাগজের মানুষগুলিকে, এবং তারপর যায় নিজের ঘরে। খাটের তলা থেকে সুটকেস বের করে মানুষগুলিকে রাখল তাতে।

তার কাঁদতে ইচ্ছে করল।

হর্তাকর্তা মিনসের জন্য কেন যেন পেতিয়ার দুঃখ হল, তিনি যেন তার চেয়ে ছোট। তিনি তাকে দিয়েছেন তাঁর কাগজের মানুষগুলি যা নিয়ে খেলেছেন সারা ছেলেবেলা।

আর পেতিয়ার ওগুলি পছন্দ হল না।
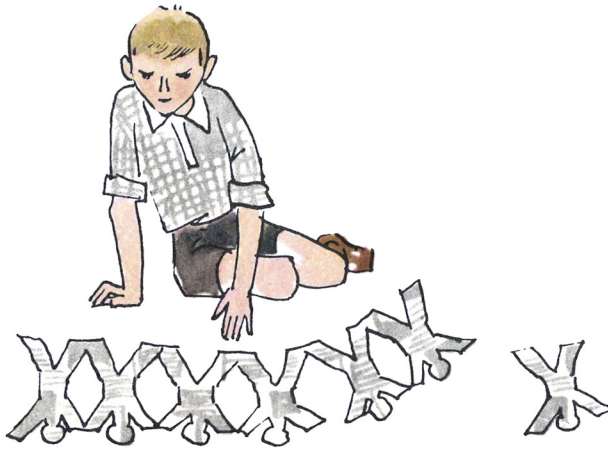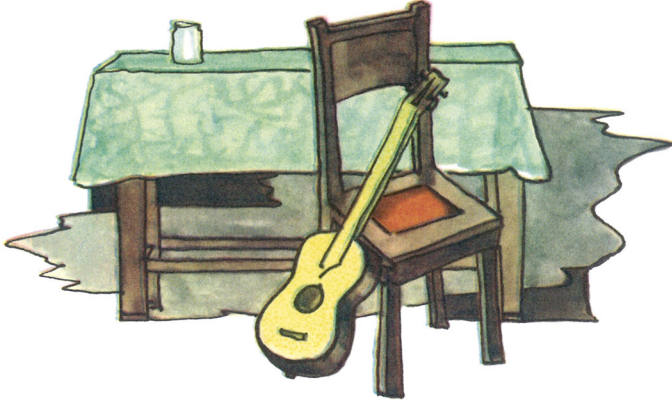
হরির খুড়ো

হরির খুড়ো বোরিয়াকে এখনও দেখে নি পেতিয়া। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখনই বোরিয়া কাকু বাড়ি ফেরে। সঙ্গে সঙ্গেই বার-বারান্দায় কোন কিছু পড়ার শব্দ শোনা যায়; এবং নিনা ইগোরেভনা তখন শুনিয়ে শুনিয়ে জোর গলায় বলেন:

— ঘরে ঢুকেছে, কিন্তু ধুলোবালি ঝাড়ে নি।

হরির খুড়ো চুপ করে থাকে। পেতিয়া বেশ কয়েক বারই ভাবল উঠে দেখবে, কিন্তু চোখ তার খুলে না, আর পা নামতে চায় না খাট থেকে। ফলে দেখাও হল না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হরির খুড়োর ঘরে গিটার বাজানোর শব্দ শুনতে পেল পেতিয়া। এবং কে যেন ধীরে ধীরে গানও গাইছে।

— আবার পরের টাকা ফুঁকেছিস! — বলেন নিনা ইগোরেভনা এবং পেতিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যান দরজা থেকে।

পরে ঢুকলেন পেতিয়ার ঘরে। যা দেখলেন তাতে তিনি অবাক।

— তুই নিজের বিছানাটি পর্যন্ত গুছাস নি!

— হাতে সময় ছিল না, — বলে পেতিয়া।

— সময় ছিল না মানে? এ দিয়েই সবকিছু শুরু হয়।

— সবকিছু মানে? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— মানে মানুষ জানোয়ারে পরিণত হয়, বুঝলি?

— সে কী করে হয়?

— খুবই সহজ। জানোয়ার কাজ করে না, কেবল বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তুইও কাজ করতে চাস না।

— কিন্তু আমি তো বনেজঙ্গলে ঘুরি না।

— তা এখন তুই ঘুরছিস না, — বলেন নিনা ইগোরেভনা। — এখনও তুই ছোট।

পেতিয়া তাড়াতাড়ি বিছানাটি গুছিয়ে ফেলে যাতে নিনা ইগোরেভনা আর কিছু না বলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করল:

— আচ্ছা, বোরিয়া কাকু কীভাবে টাকা ফোঁকে?

— মানুষের টাকা ফোঁকে, — জবাব দেন নিনা ইগোরেভনা এবং আরও বেশি রেগে যান।

— তা বুঝলাম, কিন্তু কীভাবে?

— তা তুই ওকে গিয়েই জিজ্ঞেস কর।

নিনা ইগোরেভনা জোরে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর তারপর বাড়ি থেকেই চলে গেলেন, আবার শোনা গেল দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

আর পেতিয়া গেল হরির খুড়োর কাছে। ভাবল, দরজায় ঠোকা দিয়েই ঘরে ঢুকে পড়বে।

গিটার বাজানোর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

পেতিয়া দরজার হাতলটি স্পর্শ করল: ওটা ঠান্ডা এবং মরচে-ধরা।

তারপর দরজার দিকে তাকাল: শাদা রঙ কোথাও কোথাও উঠে গেছে, এবং এক জায়গায় রঙ উঠে যাওয়াতে লম্বা লেজওয়ালা বাদামী কুকুরের মত দেখাচ্ছে। আর অন্য জায়গায় — দেখা দিয়েছে টুপি-পরা বাদামী এক থাম। পেতিয়া আরও কিছুক্ষণ এই কুকুর আর টুপি-পরা থামের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে নিজের ঘরের দিকে রওয়ানা দিল।

দরজা খোলার সময় সে করিডরে কোন শব্দ শুনতে পেল।

পেতিয়া ফিরে তাকাল, ওখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি লম্বা, মোটা ও সদয়। সে যে সদয় তা বোঝা যাচ্ছিল তার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে।

পেতিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল, লোকটি কে।

— এখানে আয়, — বলল লোকটি।

কাছে থেকে তাকে মনে হল খেলনা: মখমলী প্যান্ট, মখমলী জ্যাকেট, মাথায় খাড়া খাড়া চুল। চোখগুলিও কেমন যেন অদ্ভুত।

— আয়, আলাপ হয়ে যাক, — বলল লোকটি, এবং তার গলার স্বরটি খেলার ভালুকের মত: বু-বু-বু! সে নুইয়ে পেতিয়ার হাত ধরল: — তুই পেতিয়া না? আর আমি — বোরিয়া। চল আমার ঘরে।

ঠিক যা ভেবেছিল তাই! এ-ই হচ্ছে হরির খুড়ো। লোকে তাকে বোরিয়া কাকু বলে ডাকে।

পেতিয়া গেল তার সঙ্গে।
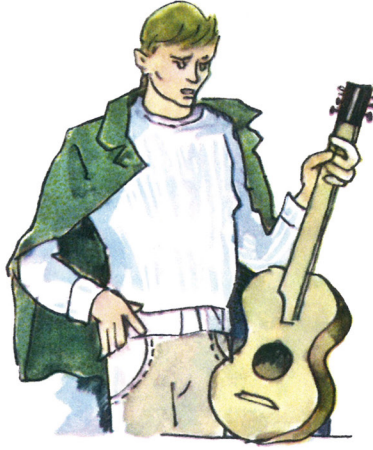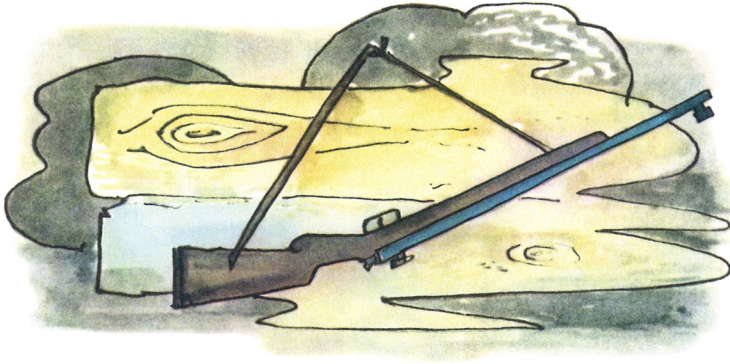
হরির খুড়ো

(পূর্বানুবর্তন)

হরির খুড়োর ঘরে সবকিছু এলোমেলো।

এক দেয়ালে ঝুলছে বন্দুক, আর অপর দেয়ালে — গিটার। গিটারের নিচে সোফা। সোফায় অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে বালিশ, বিছানার চাদর, লেপ, কম্বল... নিজের বিছানাটি গুছায় নি সে।

— নিনা ইগোরেভনা বলেন জানোয়ারেরা নাকি সব সময় বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, — বলল পেতিয়া।

— কী, কী? — জিজ্ঞেস করে বোরিয়া কাকু, মানে হরির খুড়ো।

কিন্তু পেতিয়া লজ্জা পেয়ে কিছুই বলল না। সে তাড়াতাড়ি টেবিলের তলায় ঢুকে পড়ল। ওখানে কাঠের এক বাক্স। তাতে গুলি রয়েছে। সত্যিকারের গুলি। বন্দুকের জন্য। এ রকমের একটি গুলি যদি বড় এক পাথরে রেখে তার উপর অন্য একটি ছোট পাথর দিয়ে আঘাত করা যায়!.. পেতিয়া সারা জীবন তারই স্বপ্ন দেখেছে। সারা জীবন!

পেতিয়া ফিরে দেখল। তার দিকে না তাকিয়ে বোরিয়া কাকু দরজার কাছে ইলেকট্রিক উনুনে বসাল চায়ের জল। আর যখন তাকাল, পেতিয়া তখন সোফায় বসে আছে।

— হ্যাঁ, তুই আমাকে কোনকিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছিলি? — বলে বোরিয়া কাকু।

— না, — বলে পেতিয়া এবং তার মুখটি লাল হয়ে উঠে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই আবদার করে বলল, — আচ্ছা বোরিয়া কাকু, তুমি আমায় একটু হাওয়ায় উড়াতে পার?

— আয় তাহলে, এক্ষুণি উড়াচ্ছি।

হরির খুড়ো এই বোরিয়া তার বিরাট বিরাট হাত দিয়ে পেতিয়াকে তুলে নিয়ে উপরে ছুঁড়ে দিল। তারপর সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল।

আবার ছুঁড়ে দিল।

আবার লুফে নিল।

— কী রে, লাগল হাওয়ায় উড়তে। — হেসে উঠে সে। — মজা পেলি?

পেতিয়া খুশি যে বোরিয়া কাকু তাকে হাওয়ায় উড়িয়েছে, আর তারপর লুফে নিয়েছে। সে বিশেষ আনন্দিত তাকে লুফে নিয়েছে বলে।

বোরিয়া কাকু পেতিয়াকে টেবিলের পাশে বসিয়ে বড় এক কাপে চা ঢালল তার জন্য। বেশ চিনি মেশাল তাতে। এ ছাড়া আর কিছু ছিল না তার কাছে।

— এটা তোমার গিটার? — এমনিতেই জিজ্ঞেস করে পেতিয়া — একমাত্র আলাপ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই।

বোরিয়া কাকু গিটারটি নিল:

— আয় গান গাওয়া যাক!

পেতিয়া গাইতে পারে, কিন্তু লজ্জা করছে। তখন বোরিয়া কাকু গিটারে সুর ঠিক করার জন্য এক হাতে বাজাচ্ছে আর অন্য হাতে ঘুরাচ্ছে উপরের প্যাঁচগুলি। পেতিয়ার মনে হল, এ সবকিছু যেন ঘটছে বনে। বনে কেন — সে তা জানে না, তবে তাই মনে হল। হয়তো এই জন্য যে বনে পেতিয়ার ভাল লাগে।

বোরিয়া কাকুর আঙ্গুলগুলি একটু কালো কালো, আর নখগুলি হলদে। সে গিটারটি বাজাতে লাগল। আর তারপর ধীরে ধীরে গেয়ে উঠল:

বিদায় আমার প্রাণ সজনী,
দেখা হবে কি আর কখনও গো...
যাচ্ছি চলে, আসব না আর...

পেতিয়া বুঝতে পারল না, কে ওই 'প্রাণ সজনী' আর কোথায়ই বা সে চলে যাচ্ছে। বোরিয়া কাকু জানলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেভাবে গাইছে তা দেখে দুঃখ হল পেতিয়ার। তার জন্য গায় নি বোরিয়া কাকু। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পেতিয়াকে যেন এমনকিছু বলেছে যার জন্য তাদের বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পেতিয়া কাছে এসে দাঁড়াল এবং মখমলী আস্তিনে নাকটি ঘষল। আর বোরিয়া কাকু বাজিয়েই চলেছে, চলেছে, তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু মাথাই নাড়ে, কিছু বলে না। এটাও ভাল লাগল পেতিয়ার, যেন তার সম্পর্কে বোরিয়া কাকু কিছু একটা জেনেছে।

তারপর গিটারটি সে সোফার কাছে রেখে পেতিয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

পেতিয়া তখন পকেট থেকে হাত বের করে তার দিকে গরম গুলিটি বাড়িয়ে দিল।

বোরিয়া কাকু গদ্দলিটি নিয়ে রাখল টেবিলে। কিছ্দ্বই বলল না। তারপর হঠাৎ পেতিয়াকে তুলে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পেতিয়া ভাবল, বোরিয়া কাকু নিশ্চয়ই ভীষণ রাগ করেছে, তাই তাকে ঘরের বাইরে রেখে আসতে চাইছে!

— কোথায়? — বোরিয়া কাকুর শার্টের কলার ধরে চেঁচিয়ে উঠে পেতিয়া।

— বন্ধ্দদের কাছে, — উত্তর দেয় সে।

বোরিয়া কাকু তাহলে রাগ করে নি।

সে এখন জানে যে পেতিয়া আর কখনও অমন কাজ করবে না। তাই এখন ওকে বন্ধ্দদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে।
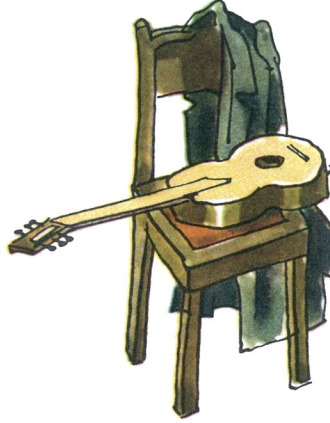
বন্ধুদের কাছে

পেতিয়াকে কাঁধে নিয়ে বোরিয়া কাকু দেউড়ি থেকে নেমে বাগানের দিকে চলল। তারপর বেড়া ডিঙ্গিয়ে সে ঢুকল বাগানে। পেতিয়া উপর থেকে দেখছে সবই।

যে এখানে ঢুকবে,
সে-ই মজাটা বুঝবে, —

বলে পেতিয়া।

— কিছুই হবে না, — উত্তর দেয় বোরিয়া কাকু। — আমরা তো আর কোন ফল খেতে যাচ্ছি না।

— কিন্তু উনি তো জানেন না, আমরা খাব কি না, — বলে পেতিয়া।

— আমরা তো জানি!

পেতিয়া তর্ক করল না, কারণ সেও ঠিক তাই ভাবছে।

হঠাৎ পেতিয়ার মুখে লাগল খসখসে একটা পাতা। তাকাতেই দেখে... আপেল!

মা দোকান থেকে যেসব আপেল কিনে আনেন এটা দেখতে মোটেই ওগুলির মত নয়। এটা একেবারে জ্যান্ত আপেল। আপেলটি রয়েছে ডালে, আর ডাল লেগে আছে গাছের কাণ্ডে। তার মানে আপেলটি ধরেছে গাছে।

আপেলটি খাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই পেতিয়ার, সে শুধু দেখতে চায়। তাই পেতিয়া তাকিয়ে রইল।

বাগানের অপর প্রান্তে একটি গেটের কাছে পেঁছিল তারা। গেট খুলতেই দেখে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন নিনা ইগোরেভনা।

— তুই ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিস? — খুব আস্তে আস্তে ও রাগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন তিনি।

— বোরিয়া কাকু আমাকে বন্ধুদের কাছে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, — উপর থেকে বলে পেতিয়া।

— তাসিয়ার কাছে, — বুঝিয়ে বলে বোরিয়া কাকু।

— কে তোকে বলেছে? — বলেন নিনা ইগোরেভনা প্রায় কানে কানে।

— বাড়িতে একা একা ওর একদম ভাল লাগছে না, — বলে বোরিয়া কাকু। — আর ওখানে ভালেরির সঙ্গে খেলবে।

— খেলবে! হুঁ, ছেলেটি শুয়ে আছে, খেলবে কী করে? তুই এখানে হরির খুড়ো, বেশি মাতব্বরী করিস না তো।

বোরিয়া কাকু দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেতিয়াকে মাটিতে নামাল।

— ছেলেটি কেন শুয়ে আছে? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— ও অসুস্থ, ওর পা ঠিক নয়, — উত্তর দেন নিনা ইগোরেভনা, তবে এখন আর তত রাগ করে নয়। — আর তুই ওকে দেখলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি... ব্যস, আমাদের নামও ডোবাবি।

— ডোবাব না, — বলে পেতিয়া।

— না হয় এমন কোনকিছু বলে বসবি... — এবং দেখা যাচ্ছিল, নিনা ইগোরেভনা ধীরে ধীরে সায় দিচ্ছেন।

— বলব না, — বলে পেতিয়া। — আমি চুপচাপ খেলব।

— সে কী করে হয় — সবকিছুই চুপচাপ? — মাথা নাড়েন নিনা ইগোরেভনা। — ওরা তাতে খুব অবাক হবে। তাছাড়া তোর নখগুলি কালো কালো... আর কান! ওরকম কান তারা কখনও দেখে নি!

বোরিয়া কাকু পেতিয়ার কান দু'টি দেখল, এবং তারপর তুলে নিয়ে তাকে কাঁধে বসিয়ে দিল।

— সব ছেলেরা যেমন হয়, — বলে বোরিয়া কাকু। তারপর তারা চলে যায়।

তারা এক টিলার উপরে উঠল, ওখানে পেতিয়া ছোট্ট একটি বাড়ি দেখতে পেল। বাড়ির চারিপাশের বেড়াটি মাটিতে পড়ে রয়েছে, আর কোথাও কোথাও তার ফাঁকে ফাঁকে শালগমের চারা গজিয়ে আছে। বাড়ি ঘিরে আছে বিভিন্ন লতাপাতা আর উঁচু উঁচু ঘাস।

বাড়িটি পুরনো, আর রঙ না করা তক্তার মধ্যে মধ্যে ছিদ্রও রয়েছে।

বোরিয়া কাকু দরজাটি একটু খুলে অন্ধকার বার-বারান্দার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

— তাসিয়া, ঘরে আছ?

— এসো, ভেতরে এসো! —সাড়া দেয় কোন এক অপরিচিতা তাসিয়া। তারপর বেরিয়ে আসে। এ তো তাসিয়া নয়, তাসিয়া মাসি। সেজেগুজে খুব ফিটফাট, গায়ে লাল পোশাক, সেন্টের গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

— আচ্ছা এই-ই কি আমাদের পেতিয়া মোশায়? — জিজ্ঞেস করে তাসিয়া।

পেতিয়া ভাবল, তাসিয়া মাসি এক্ষুণি বলবে যে সে নীরস, তাই তার মুখ একটু কালো হয়ে গেল। কিন্তু ও বলল অন্য কথা:

— ঠিক আছে, নাম এবার ঘোড়া থেকে!

— ইনি বোরিয়া কাকু, — বুঝিয়ে বলে পেতিয়া। কারণ সত্যিই ও ছিল বোরিয়া কাকু, ঘোড়া নয়। আর পেতিয়া অত ছোট নয় যে ওকে ঘোড়া ভাববে।

তখন তাসিয়া মাসি ওকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করে।

— তুই কিন্তু ভীষণ কড়া লোক। জানিস, আমি তোর মা'র সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছি।

শুনে পেতিয়া খুব খুশি হল, কারণ মা তাকে একবার বলেছিলেন কীভাবে তাঁদের স্কুলে একটি মেয়ে বেঞ্চি থেকে পড়ে যায়। ওই মেয়েটি নিশ্চয়ই এই তাসিয়া মাসি। কিন্তু পেতিয়া তাকে বলল না যে সে এ ঘটনাটি জানে, — মা হয় তো চান নি যে সে তা বলে।

তাসিয়া মাসিকে পেতিয়ার পছন্দ হল। তাই সে সঙ্গে সঙ্গেই তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, এবং তারা দু'জনে গেল ভালেরির কাছে।

তাসিয়া মাসি তাকে সোফার কাছে নিয়ে গেল। ওখানে শুয়ে আছে অসুস্থ ছেলেটি।

পেতিয়া তার দিকে তাকিয়ে থাকল না। সে সঙ্গে সঙ্গেই মাছগুলির দিকে মন দিল।

মাছগুলি সাঁতার দিয়ে ঘুরাফেরা করছে কাচের বাক্সে। বাক্সগুলি জানলার ধারে। তলায় হলদে বালু, জলে কোঁকড়া কোঁকড়া সবুজ কীসব ঘাস।

বাক্সগুলি বাল্ব দিয়ে আলোকিত, যেমনটি হয় জলতলের রাজপুরীতে।

মাছগুলি ছোট ছোট — লাল ও কালো, বেশ সুন্দর, তবে ওগুলি ছাড়াও চলত।

বাক্সের কাচে প্রতিফলিত হচ্ছে কামরা এবং সোফা। আর সোফার উপর অসুস্থ ভালেরি। ভালেরি যাতে দেখতে না পায় কীভাবে পেতিয়া তার দিকে তাকাচ্ছে পেতিয়া বাক্সের গায়ে আঙুল দিয়ে ঠোকা মারে; তাতে জল কেঁপে উঠে, আর মাছগুলি তখন থেমে গিয়ে লেজ নাড়ে ও মুখ খুলে।

মাছ অনেকখন দেখল পেতিয়া — আর ভাল লাগছে না। সে ওগুলির দিকে তাকাচ্ছে না, শুধু অসুস্থ ছেলেটির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় এল তাসিয়া মাসি আর বোরিয়া কাকু।

— কী, আলাপ হল? — খুশি মনে জিজ্ঞেস করে তাসিয়া মাসি। — এবার তাহলে চা খাওয়া যাক।

তাসিয়া মাসি তাড়াতাড়ি টেবিলটি ঠেলে দিল সোফার কাছে, তারপর তাতে রাখল কাপপ্লেট এবং বাড়িতে তৈরি কেক। নিনা ইগোরেভনা যখন ওরকম কেক তৈরি করেন, তিনি প্রায়ই বলেন:

'দেখো তো, কেকটি কী চমৎকার হয়েছে! খেতে কষ্ট লাগে!'

পেতিয়া তাকাল না ছেলেটির দিকে এবং চেষ্টা করল কোন বাজে কথা না বলতে। কিন্তু কিছু তো বলতে হবে, তাই সে বলে উঠল:

— আজ বাজারে মাংস কিন্তু তাজা!

— কী, কী? — জিজ্ঞেস করে কেন যেন হেসে ফেলে তাসিয়া মাসি।

নিনা ইগোরেভনা মাংসের কথা বলতে গিয়ে কখনও কিন্তু হাসেন না।

বোরিয়া কাকু আর ভালেরিও হেসে উঠল।

— তুই খা তো দেখি, — রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলে তাসিয়া মাসি এবং পেতিয়াকে কেটে দেয় বড় একটুকরো কেক।

পেতিয়া বলতে চাইল যে এই কেকটি চমৎকার এবং খেতে মনে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু বলল না, যদি আবার সবাই হেসে ওঠে।

সে কেক খেতে লাগল, কিন্তু কেন যেন তা গিলতে পারছিল না। পেতিয়া চায়ের কাপে মুখ দিল, জিহ্বা যেন পুড়ে গেল। টেবিল ক্লথ আর হাঁটুতে পড়ল চা, তখন পেতিয়া চেয়ার থেকে নেমে এমনভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে যাতে কেউ কোনকিছু লক্ষ্য না করে।

কিন্তু বার-বারান্দায় তাকে ধরে ফেলল বিরাট দু'টি হাত, — সিগারেটের গন্ধে সঙ্গে সঙ্গেই পেতিয়া চিনতে পারল বোরিয়া কাকুকে।

— কিছু হয় নি, পেতিয়া, — বলল বোরিয়া কাকু এবং হাত দিয়ে পেতিয়ার গাল ও নাক মুছে দিল। — চল এবার আস্তে আস্তে বাড়ি যাওয়া যাক, কাল আবার আসব।

পেতিয়া বলতে চাইল যে সে আর আসবে না। কিন্তু বলল না। তারা রওয়ানা দিল বাড়ির দিকে।
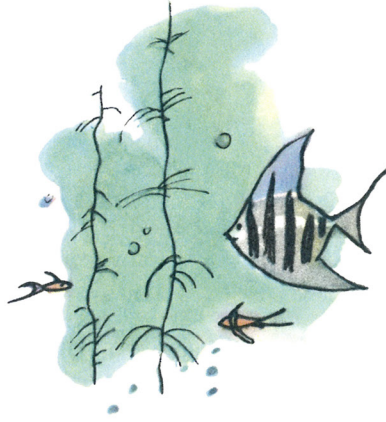
কাপ্তেন

পরের দিন সূর্য ছিল আকাশে। প্রথমে রোদ আসে ঘরের মেঝেতে, পরে চলে যায় দেউড়িতে, আর তারপর — বাগানে।

পেতিয়া বেড়া ডিঙ্গিয়ে বাগানের পথ ধরে হাঁটতে থাকে। এখন সে জানে যে এখান দিয়ে চলা যায়, কেননা সে তো কিছুই ছিঁড়বে না।

গেটের ওপাশেও রোদ। ওখানে পোড়ো জমি। পড়ে রয়েছে টিনের পুরনো কৌটো, শাদা শাদা হাড়, হলদে খড়কুটা। রোদ্রের তাপে খড়কুটা থেকে ভাপ বেরুচ্ছে। আর চারিপাশে ছোটখাটো ঝোপঝাড়, লতাপাতা। ওগুলো দাঁড়িয়ে আছে একেবারে নিশ্চল। হঠাৎ শোনা গেল একটি শব্দ। মনে হল যেন ঝোপঝাড়ের নিচ দিয়ে কোনকিছু ছুটে গেল। সত্যিই ওখানে কোনকিছু ছুটে গেল!

পেতিয়া একটি ঝোপে তাকাল — কিছু নেই। তাকাল অন্যটিতে... ওখানে কিছু একটা বসে আছে এবং পেতিয়ার দিকে তাকিয়ে রয়েছে গোল গোল কালো কালো চোখে। ঠোঁট হলদে।

পাখির ছানা!

ছানাটি ছিল ধূসর রঙের ও বড়। পেতিয়াকে দেখে সে অবাক। উড়ছে না। ও একেবারে কুঁজোটে হয়ে আছে এবং ডানায় ঝুলছে ধূসর একটা পালক।

— আয় আমার কাছে, — নুইয়ে গিয়ে বলে পেতিয়া।

পাখির ছানাটি নড়লই না, শুধু তাকিয়েই রইল। তখন পেতিয়া সেটাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল।

ছানাটি সঙ্গে সঙ্গে ছাড়া পেতে চাইল এবং আঁচড় কাটতে লাগল পেতিয়ার হাতে। কিন্তু পেতিয়া ওকে ছাড়ল না। সে চলল সেই টিলার দিকে যেখানে গতকাল উঠেছিল বোরিয়া কাকুর সঙ্গে। শিগগিরই পেঁছিল পড়ে থাকা বেড়াটির কাছে।

আর বাড়ির কাছে বাইরে খাটে শুয়ে আছে একটি ছেলে এবং — বোঝাই যাচ্ছিল — সে তাকাচ্ছে পেতিয়ার দিকে।

পেতিয়া ছুটে চলে যেতে চাইল, কিন্তু তার হাতে ছিল পাখির ছানা। ওটাকে মাথার উপর তুলল।

— ওটা কী তোর হাতে? — চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে ছেলেটি। তার গলার আওয়াজটি ছিল হাসিখুশি, যেকোন সাধারণ ছেলেমেয়েরেই মত।

— পাখির বাচ্চা! — জবাব দেয় পেতিয়া।

— দেখা তো! — আরও জোরে চেঁচায় ছেলেটি এবং কনুইতে ভর দিয়ে একটু ওঠে।

তখন পেতিয়া পড়ে থাকা বেড়া ডিঙিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে ছুটে গেল তার কাছে।

— নে, দেখ! ঝোপের তলায় খুঁজে পেয়েছি।

পেতিয়ার হাত থেকে পাখির ছানাটি নিয়ে দেখতে লাগল ছেলেটি।

আর পেতিয়া দেখতে লাগল ছেলেটিকে।

ও ছিল পেতিয়ার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তেমন একটা অসুস্থ নয়, মেজাজটিও হাসিখুশি। তার পুরো শরীর রোদে-পোড়া; আর একটি হাত অসংখ্য আঁচড়ে ভরা। সব ছেলেদেরই মত। আর চোখগুলি তার লালচে বাদামী, বেড়ালের মত কিংবা কাঠের পেঁচার মত। দৃষ্টি মোটেই গম্ভীর নয়। সে হাতে পাখির ছানাটিকে ঘুরাচ্ছে আর কথা বলছে তার সঙ্গে:

— কী রে হাঁদারাম, বাসা থেকে পড়ে গেছিস? আর উড়তে তো পারিস না। তুই একটা আস্ত বোকা, বুঝলি?

ছানাটি বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে, যেন কথাগুলি খুব একটা বুঝতে পারছে না, কিন্তু বুঝতে চাইছে। আর যখন তাকে বোকা বলা হল, চোখই বন্ধ করে দিল — রেগে গেছে।

পেতিয়া ও ভালেরি হেসে উঠল।

— এটা কী পাখি? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— তোর কী মনে হয়? — বলে ভালেরি।

সে মাথা নুইয়ে পেতিয়াকে দেখতে লাগল। সেও জানতে চায় — পেতিয়া ছেলেটি কেমন।

পেতিয়া কিছুক্ষণ ভাবল, কাঁধ ঝাঁকাল। সে জানে না এটা কী পাখি।

— তাহলে আমার ধাঁধার উত্তর দে, — বলে ভালেরি। — চলবে?

পেতিয়া জবাব দেয়, চলবে।

— তাহলে বল, কোন পাখির বুক কালো, আর ডানা ও মাথা ধোঁয়াটে?

— আমি জানি না, — বলে পেতিয়া। আর পরে আন্দাজের উপর বলে: — ঈগলের?

— হুং, ঈগল! কী যে বলিস... — এবং ভালেরি একটু হেসে ফেলল। পরে যখন দেখল যে পেতিয়া ঠোঁট ফুলিয়ে দিয়েছে, অমনি হাসা বন্ধ করল। — ঠিক আছে। বল তাহলে, কোন পাখি মানুষের কাছ থেকে সব ভাল ভাল খাবার ছিনিয়ে নিতে ভালবাসে।

এটা পেতিয়া জানে।

— ম্যাগপাই পাখি! — চেঁচিয়ে উঠে পেতিয়া।

— ঠিক, — বলে ভালেরি। — কিন্তু আমাদেরটা ম্যাগপাই নয়। অন্য পাখিরাও খাবার ছিনতে ভালবাসে। জানিস কোনগুলি? যেগুলি কা-কা বলে ডাকে!

— কাক, কাক! — আগের চেয়ে আরও জোরে চেঁচায় পেতিয়া। — মানে, এটা কাক?

— হ্যাঁ, কাক... তাও বোকা, — হেসে ফেলে ভালেরি এবং তাকায় পাখির ছানাটির দিকে। আর ছানাটি তার আঙুলে মারে এক ঠোকর: আবার রাগ করেছে।

— আরে, এটা কী রে? — জিজ্ঞেস করে তাসিয়া মাসি।

পেতিয়া টেরই পায় নি কখন সে কাছে এল।

তাসিয়া মাসি ছিল গতদিনের মতই হাসিখুশি, সেজেগুজে ফিটফাট, তবে গায়ের পোশাকটি আজ নীল রঙের।

— নে, ধর, — তাসিয়াকে ছানাটি দিতে দিতে বলে ভালেরি।

ও দেখতে লাগল পাখির ছানাটিকে এবং হেসে ফেলল ছোট্ট খুকীর মত।

— তোর গা বেশ গরম তো! — পাখিটিকে বলে সে। — বেচারা, একেবারে দিশাহারা!

ছানাটি মাথা নোয়াল ওর বৃদ্ধাঙ্গুলিটির দিকে।

— তাসিয়া! — বলে ভালেরি। — এই কাকের বাচ্চাটি সব বুঝে। তাকে গালি দিলে রাগ করে; তাকে নিয়ে হাসাহাসি করলে অভিমান করে। আর এখন...

— হাসাহাসি করার কী আছে! — বলে তাসিয়া মাসি। — লক্ষ্মীসোনাটির খিদে পেয়েছে, খাওয়াতে হবে। — এবং সে কাকটিকে ঘরে নিয়ে গেল।

পেতিয়া চেয়ে রইল তাসিয়া মাসির পেছন পানে। সত্যিই কি ও ভালেরির মা নয়!

পেতিয়া জিজ্ঞেস করতে চাইল ভালেরিকে কেন সে ওকে তাসিয়া বলে ডাকে, কিন্তু সুন্দর দেখায় না বলে জিজ্ঞেস করল না।

— জানিস, নিনা ইগোরেভনা আমার আপন দিদিমা নন, — ভালেরির দিকে না তাকিয়েই বলল পেতিয়া।

— জানি, জানি, — বলে ভালেরি, এবং পেতিয়ার মনে হল ও যেন আবার হাসছে। — তবে তাসিয়া আমার সবচেয়ে আপন মা। এমনিতেই আমি ওকে নাম ধরে ডাকি।

পরে পেতিয়ার দিকে তার মজবুত হাতটি বাড়িয়ে দিল:

— তুই কিন্তু মজার ছেলে। আয় আলাপ হয়ে যাক। তোর নাম পেতিয়া, তাই না?

— পেতিয়া।

— আর আমার নাম তুই শুনেছিস নিশ্চয়ই?

— হ্যাঁ, শুনেছি।

— আর তুই জানিস, আমি কে?

পেতিয়া কাঁধ ঝাঁকাল। সে জানে, কিন্তু জানে না কীভাবে বলবে।

— আমার কী হয়েছে জানিস?

পেতিয়ার মুখ একটু লাল হয়ে উঠে এবং আবার কিছু বলে না।

— শোন তাহলে। আমি হচ্ছি কাপ্তেন। জাহাজডুবিতে পড়ি। পুরো বাহিনীই মারা যায়। আর আমাকে ঢেউ ছুঁড়ে ফেলে তীরে।

— আর তোর জাহাজ কোথায়? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— ওই যে ওখানে। — ভালেরি হাত দিয়ে ওই দিকে দেখায় যেদিক থেকে এসেছে পেতিয়া। — তীরে কেবল টুকরোগুলি পড়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পোড়ো জমিটির কথা মনে পড়ল পেতিয়ার। ওখানে টিনের কত পুরনো কৌটো, হাড়, খড়কুটা। কিন্তু সাগর তো ওখানে দেখে নি। জাহাজও। হতে পারে তা দূরে কোথাও রয়েছে।

— আর এখন কী করা? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— কী আর করা, এখানেই শীত কাটাতে হবে, — বলে ভালেরি।

— আমিও এখানে শীত কাটাতে চাই, — বলে পেতিয়া।

— তাহলে ঝুপড়ি বানাতে হবে, — ঘোষণা করে ভালেরি।

আর পেতিয়া ঝুপড়ি বানানো শুরু করে দিল।

ঝুপড়ি

ঝুপড়ি বানানো খুবই সহজ, কেবল মালমসলা থাকলেই হল। তাই বলল ভালেরি।

আর মালমসলা হচ্ছে ডালপালা।

— কোন ডালপালা নেয়া যায়? — জিজ্ঞেস করে ভালেরি।

— এই যে এগুলি, — পেতিয়া ফারগাছের দিকে নির্দেশ করে: ওটার ডালগুলি লম্বা লম্বা, ঝুপড়ি বানাতেও সুবিধে হবে।

— যা তাহলে নিয়ে আয়, — বলে ভালেরি।

পেতিয়া গেল ফারগাছের তলায়। ওখানে অন্ধকার, গুমোট। জায়গাটি ফারের গন্ধে ভরপুর।

গাছের কাঁটাগুলি ভীষণ সরু। পেতিয়ার সমস্ত হাত খুঁচিয়ে দিয়েছে। ফারের তলায় ঘাস প্রায় নেই, আর মাটি শুকনো। আর এক জায়গায় — যেখানে শিকড় — রয়েছে এক ঢিপি।

ঢিপিটি ভেঙ্গে পেতিয়া দেখে বেঙের এক ছাতা। তার সবুজ ও শাদা টুপিটি মাটি-মাখানো।

পেতিয়া তুলে নিল বেঙের ছাতাটি — খুবই ছোট, গোল টুপিটি প্রায় লেগে আছে পায়ের সঙ্গে।

— আমি বেঙের ছাতা পেয়েছি! — চেঁচাতে চেঁচাতে সে বেরিয়ে আসে ফারগাছের তলা থেকে।

ভালেরি বেঙের ছাতাটি হাতে নিল:

— এটা খায় না।

— এটা কি বিষাক্ত? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— হ্যাঁ, বিষাক্ত, — বলে ভালেরি। — তা তোর কেমন লাগল ফারের তলায়? ভাল লেগেছে?

পেতিয়া খোঁচানো হাতগুলি মুছতে মুছতে বলে:

— হ্যাঁ, ভাল লেগেছে। ওখানে আছে বেঙের ছাতা।

— তুই চাস যে আমাদের ঝুপড়িতেও বেঙের ছাতা গজাক? — হেসে উঠে ভালেরি।

পেতিয়া কিছুই বলল না। সে বেঙের ছাতা ভাজা খেতে খুব ভালবাসে। মা যদি এখানে থাকতেন তাহলে অনেক আগেই তা তুলে নিয়ে ভাজা করত তারা।

— তোদের বাগান নেই? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— তাসিয়ার সবজি ভূঁই আছে। ওখানে রয়েছে শশা, মটর। চাই তোর?

পেতিয়া কখনও দেখে নি কীভাবে শশা জন্মায়। এমনকি তার খাওয়ারও খুব ইচ্ছে হল। সবুজ মটরশুঁটিও সে খেতে চায়। ওগুলি খেতে কী মজা! মা কিনেছিলেন।

মা জানেন কখন পেতিয়ার খিদে পায় এবং কী সে খেতে চায়। আর কেউ তা জানে না।

— না, — বলে পেতিয়া, — ধন্যবাদ। আমার পেট ভরা। — লালা গিলল সে। সকালে জাউ খায় নি বলে আফসোস হল তার।

ভালেরি খুব মন দিয়ে দেখল পেতিয়াকে, তারপর বালিশের তলা থেকে বের করল একটি ঘড়ি — হ্যাঁ, হ্যাঁ, সত্যিকারের ঘড়ি! — এবং কানের কাছে নিল।

— এখানে আয়। লম্বা কাঁটাটি দেখছিস? এটা ছোট্ট কাঁটাটি অবধি পেঁছিতে না পেঁছিতেই তাসিয়া আমাদের জন্য দই নিয়ে আসবে।

পেতিয়া কাঁটাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল। হয়রান হয়ে গিয়ে যখন পেছনের দিকে চোখ ফেরাল, দেখল তাসিয়া মাসিকে: ও হাতে শাদা দু'টি গ্লাস নিয়ে আসছে।

— সবকিছু সময় মত করা — এই হচ্ছে জাহাজের কাপ্তেনদের নিয়ম। — বলে ভালেরি।

পেতিয়া খুব খুশি। সময়নিষ্ঠতা তারও ভাল লাগে; তবে এর চেয়ে বেশি ভাল লাগে — চিনি মেশানো দই।
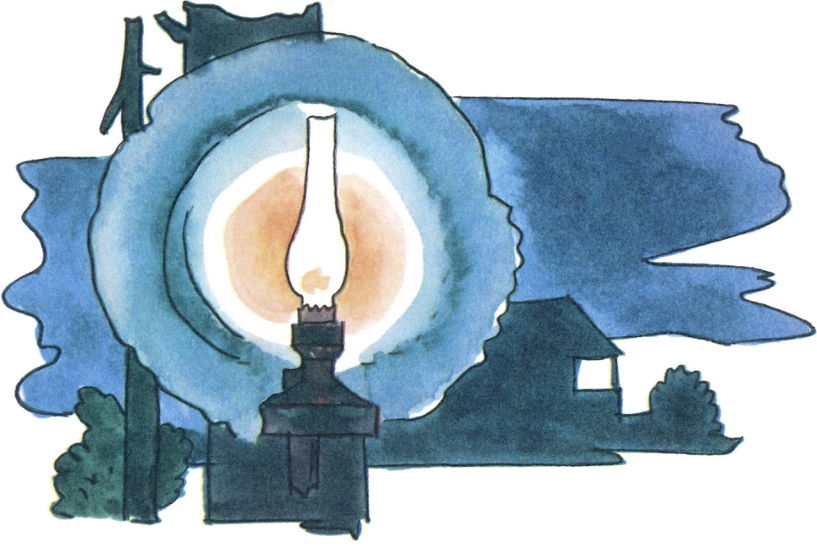
নেকড়ের পা

নিনা ইগোরেভনাকে যদি বলা যায়: 'আমার ঝুপড়ি বানাতে ইচ্ছে হচ্ছে।' তিনি কী উত্তর দেবেন?

তিনি উত্তর দেবেন: 'এখন ইচ্ছে হচ্ছে, তবে শিগগিরই ইচ্ছে চলে যাবে।'

কিন্তু তাসিয়া মাসি যেই ঝুপড়ির কথা শুনল সঙ্গে সঙ্গেই পেতিয়াকে এনে দিল ছোট্ট একখানি পেন্সিল-কাটা ছুরি — তার হাড়ের হাতলটি হলদে।

— ডাল কেটে নিয়ে আয়, — বলে তাসিয়া মাসি।

— কোনগুলি?

— তা ভালেরিই ভাল জানে, ওকে জিজ্ঞেস কর।

— প্রতিটি ঝোপ থেকে একটি করে পাতা নিয়ে আয় আমার কাছে, — বলল ভালেরি। পেতিয়া নিয়ে এল। একটি পাতা ছিল গোল, খাঁজ-ভরা ও খসখসে:

— এটা বার্চ — বলে ভালেরি, — এর ডাল ভাঙ্গবি না, এটা পরে বড় গাছ হবে।

— বার্চ তো শাদা হয়, — বলে পেতিয়া। সে ভালেরিকে কিছুটা বিশ্বাস করল না, কারণ বার্চ গাছ হয় শাদা, আর এটার কান্ড বাদামী।

ভালেরি হয়তো বুঝল — পেতিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল:

— তুই যদি এতই পণ্ডিত হয়ে থাকিস তাহলে দশ বছর পরে এসে দেখিস — এর রঙ কেমন হয়।

পেতিয়া লজ্জায় একটু লাল হয়ে গেল। অন্য পাতাটি দিল। এই পাতাটি ছিল মসৃণ, আর তার কাছে ডালে কয়েকটি বেরিফল: কোন-কোনটি লাল, আর কোন-কোনটি কালো।

— আচ্ছা, এগুলি নেকড়ে বেরি, — বলে ভালেরি। — কিছু বোকা ছেলেমেয়ে এগুলি খায়। তুই খেয়েছিস কখনও?

পেতিয়া কিছু বলল না। সে নুইয়ে একটি ঘাস ছিঁড়ে নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল:

— এগুলোর নাম নেকড়ে বেরি কেন? নেকড়েদের জন্য?

— না, — উত্তর দেয় ভালেরি, — মানুষের জন্য। — তারপর গলা লম্বা এবং চোখ বড় বড় করে ভয় দেখিয়ে বলে: — যে এগুলি খাবে তারই গজাবে নেকড়ের পা।

— নেকড়ের পা? সে আবার কী রকম? — ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— খুবই সাধারণ, নেকড়ের যে রকম হয়।

পেতিয়ার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেল।

— আর তারপর?

— তারপর ওই পা মানুষকে বনে নিয়ে যায়।

— কখন?

— অবশ্যই রাত্তিরে। হ্যাঁ, দেখা আর কী কী পাতা আছে তোর কাছে।

পেতিয়া আর একটা একটা করে দেখাল না। সে হাতের মুঠো খুলল, এবং ভালেরি সবচেয়ে বড় গোল পাতাটি বেছে নিয়ে শুঁকল ও পেতিয়াকে শুঁকতে দিল।

পেতিয়া জিজ্ঞেস করতে চাইল: 'ঘর থেকে কী করে মানুষকে নিয়ে যাবে? ঘর থেকে নেওয়া অসম্ভব!'

পাতাটিতে তেমন কোন বিশেষ গন্ধ ছিল না, কিন্তু ভালেরির ওটা খুব পছন্দ হল।

— আয়, অ্যাল্ডার গাছের ডাল দিয়েই ঝুপড়ি বানাই, কী বলিস? — খুশ মেজাজে পেতিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে ভালেরি।

— ঠিক আছে, — বলে পেতিয়া।

সে ছুরি দিয়ে ডাল কাটতে লাগল।

পেতিয়ার দৃষ্টি সেই গাছপালার পেছনে যেখানে ডুবছে সূর্য।

সূর্যটি লাল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল, ডুবতে লাগল খুব দ্রুত।

ঘাস ভেজা ও ঠান্ডা, আর আকাশে, তখনও উজ্জ্বল আকাশে, হঠাৎ আবির্ভূত হল শাদা অর্ধ-চক্রাকার চাঁদ।

পেতিয়া আগে কখনও দেখে নি এরূপ দৃশ্য: আকাশে সূর্য থাকতেই চাঁদের আবির্ভাব। সে বুঝতে পারল না — তখন দিন না রাত। ডাল বেশি কাটা হয় নি। যা হয়েছে তাই দু' হাতে জড়িয়ে ধরে দ্রুত পায়ে চলল বাড়ির দিকে।

ভালেরি খাটের উপর বসে বই পড়ছে।

— আচ্ছা, এনেছিস, সাবাস পেতিয়া, — তার দিকে না তাকিয়েই বলে ভালেরি। ভালেরি অনেক বড় হয়ে গেছে, তার বইখানি ছবি ছাড়া।

— আর বোরিয়া কাকু কোথায়? — আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— ও হয়তো আসবেই না, — বইটি রেখে দিয়ে উত্তর দেয় ভালেরি। — অন্ধকার হয়ে আসছে।

— আমি বাড়ি চললাম, — আরও আস্তে আস্তে বলে পেতিয়া।

— দাঁড়া। তাসিয়া যেন তোর দিদিমার জন্য কী পাঠাতে চায়। তাসিয়া!

— আসছি! — ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয় তাসিয়া মাসি। জানলায় আলো, আর আলোকিত জানলার চারিদিকে অন্ধকার।

— তাসিয়া, পেতিয়া চলে যাচ্ছে! — আবার ডাক দিল ভালেরি এবং পেতিয়ার দিকে ফিরল: — আচ্ছা বল তো তোর এত তাড়া কিসের?

পেতিয়া নিজেই জানে না তার এত তাড়া কিসের, কিন্তু খুব তাড়া রয়েছে।

সূর্য একেবারে ডুবে গেছে। আকাশ অন্ধকার-নীল, আর অর্ধ-চন্দ্রাকার চাঁদ এখন আর শাদা নয়, হলদে, — তাসিয়ার ঘরের উজ্জ্বল জানলারই মত অনেকটা।

তাসিয়া মাসি হালকা একটি টেবিল এনে রাখল ভালেরির খাটের কাছে এবং শাদা একটি চাদর বিছিয়ে দিল তার উপর। চারিদিকে ঝোপঝাড়, গাছপালা সবকিছু ডুবে গেছে অন্ধকারে।

— আচ্ছা বোরিয়া কাকু কখন আসবে? — ফের জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— আসবে, আসবে, — বলে তাসিয়া মাসি। — আয় তো আমাকে চেয়ার আনতে সাহায্য কর। — পেতিয়া যখন তার ঠাণ্ডা আঙুলগুলি তাসিয়ার গরম ও শক্ত হাতের মধ্যে রাখল, তাসিয়া মাথা নিচু করে তাকে চুপি চুপি বলল: — জানিস, আজ ভালেরির জন্মদিন। ও কিন্তু ভুলে গেছে। বোরিয়া আর আমার মনে আছে... — তাসিয়া মাসি হেসে ফেলে ও পেতিয়াকে জড়িয়ে ধরে: — ঠাণ্ডায় জমে যাস নি তো? এত মনমরা কেন রে?

— যদি কেবল একটিমাত্র বেরি খাই? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— কোন বেরি? — বুঝল না তাসিয়া।

— নেকড়ে বেরি...

— নেকড়ে বেরি খায় না, — বলে তাসিয়া মাসি এবং তাকে বেতের একটি চেয়ার দেয়। — এটা নিয়ে যা।

পেতিয়া পাইন গাছ অবধি চেয়ারটি নিয়ে গেল। ওখানেই ছিল খাটটি। সে চেয়ারে বসল এবং কেঁদে ফেলল।

তাসিয়া ভয় পেয়ে গেল।

— লেগেছে কোথাও? কী হয়েছে তোর, পেতিয়া? শিকড়ে হোঁচোট খেয়েছিস?

— আমি একটি খেয়ে ফেলেছি, — ফোঁপাতে থাকে পেতিয়া।

— কী খেয়ে ফেলেছিস?

— নেকড়ে বেরি।

— তা কিছু না, — বলে তাসিয়া মাসি। — পেট ব্যথা করছে না তো?

ব্যাপারটি যেন আসলে পেট নিয়ে!

— আমার নেকড়ের পা গজাবে! — আরও জোরে কেঁদে উঠে পেতিয়া।

— এ কথা কে তোকে বলেছে? — অবাক হয় তাসিয়া।

— ভালেরি।

— ও তামাসা করেছে, পেতিয়া! তামাসা করেছে!

দেখাই যাচ্ছে পেতিয়ার জন্যে তাসিয়ার কী দরদ। তাই সে ওকে সান্ত্বনা দেয়।

পেতিয়া হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে: 'উ-উ-উ...'

— বল তো ভালেরি, ওকে বল যে তুই তামাসা করেছিস, — রাগ করে তাসিয়া মাসি।

— মোটেই তামাসা করি নি আমি, — জবাবে বলে ভালেরি।

পেতিয়া চুপ থাকে। নিশ্চয়ই, এত বড় ছেলে তামাসা করতেই পারে না।

— আয় তো আমার কাছে, পেতিয়া, — বলে ভালেরি।

পেতিয়া এল, বসল খাটে।

— দেখা তো তোর ডান পা'টি। বেশ, নেকড়ের পা এই যে এখানে গজায়, ডান পায়ের এক পাশে; নেই, কিছুই নেই। হ্যাঁ, তুই তো কেবল একটাই খেয়েছিস, তাই না?

— পুরোটা খাই নি, মুখ থেকে ফেলে দিয়েছি।

— আচ্ছা, তাই বুঝি! তাহলে বাঁচা গেল। রাত্রে নেকড়ের পা গজায় না। দিনের বেলায় যেহেতু গজায় নি, তার মানে আর কিছু হবে না। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারিস।

ভালেরি সান্ত্বনা দিচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে যে সে সত্যি কথা বলছে।

পেতিয়া শেষবার কেঁদে নিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেসে ফেলল:

— তুই কিন্তু একটি কথা জানিস না! তাসিয়া মাসি আমাকে বলেছে!

দেউড়ির কাছে একটি আলো দেখা গেল, — কেরোসিনের বাতি হাতে নিয়ে আসছে তাসিয়া।

বাতি সে ঝুলিয়ে দিল গাছে লাগানো একটা আংটায়।

পেতিয়ার মনে হল, চারিদিকে বন আর বন, আর তার মাঝখানে হাসিখুশিতে ভরা ছোট্ট একখানি আলোকোজ্জ্বল বাড়ি।
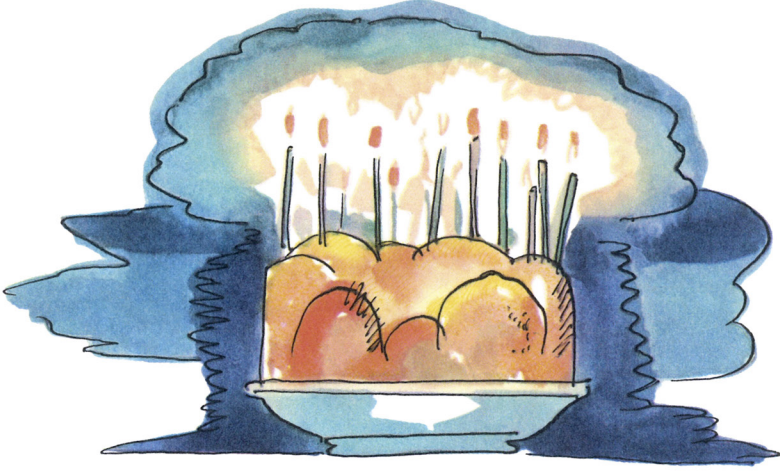
জন্মদিন

বাতির আলো দেখে উড়ে এল শাদা মোটা এক প্রজাপতি। তারপর আরও একটি। আরও। তারা ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল চিমনির চারিদিকে। খাটের উপর অন্ধকার থেকে নুইয়ে পড়েছে স্বচ্ছ সবুজ পাতাগুলি-দিনের বেলায় তা অমন সবুজ আর স্বচ্ছ ছিল না। আর যে পাইন গাছটিতে বাতি ঝুলছে তার খয়েরী ছালে রয়েছে ঢেউয়ের মত অসংখ্য দাগ।

হয়তো বা এগুলি রাস্তা, আর এই রাস্তার ধারে ধারে নিশ্চয়ই ছোট্ট কোন প্রাণীরা বাস করে?

পেতিয়া জীবনে কোনদিনই এরূপ পরিবেশে পড়ে নি। সে কেবল চারিপাশে তাকিয়ে দেখে, তার বিস্ময়ের শেষ নেই।

তাসিয়া মাসি কোন কথা না বলে টেবিলে রাখল চকলেট, বিস্কুট আর কেক। পেতিয়ার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল সে। রহস্যের হাসি সেটা।

আর ভালেরি শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। সে চুপচাপ তাকিয়ে রয়েছে খাটের উপরে এলিয়ে পড়া স্বচ্ছ পাতাগুলির দিকে। তাসিয়াকে সে জিজ্ঞেসই করল না কেন এত চকলেট আর কেক।

পরে অন্ধকারে পেতিয়ার চোখে পড়ল লাল একটি উজ্জ্বল বিন্দু এবং ওটা ক্রমশই কাছিয়ে আসছে। পেতিয়া ছাড়া আর কেউ-ই দেখে নি। সে মোটেই নেকড়ের কথা ভাবে নি। কেননা যেখানে বিন্দুটি দেখা যাচ্ছিল, ওখানে কী যেন বাজছিল। পেতিয়া বুঝতে পারল কী ওটা। কিন্তু সে চুপ করে থাকে, চুপ থাকাই যেন উচিত ছিল। তাতে ব্যাপারটা আরও বেশি রহস্যময় হয়।

শিগগিরই গিটার হাতে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল বোরিয়া কাকু। সে গিটার বাজিয়ে জোরে গেয়ে উঠল:

বেঁচে থাক রে ভালেরকা,
তেরো বছরের খোকা!

ভালেরি হেসে উঠল ও হাততালি দিল।

— বোরিয়া কাকু, জন্মদিনের কথা আমারও মনে ছিল। আমি ভেবেছিলাম, তুমি জান না! শহরে সবাই জানে, আর এখানে কেউ না।

— দেখলি তো, এখানেও সবাই জানে! — খুব আনন্দের সঙ্গে বলে তাসিয়া মাসি এবং কেকে গাড়তে থাকে ছোট্ট ছোট্ট মোমবাতি।

আর বোরিয়া কাকু অন্ধকারের দিকে একটু সরে গেল। দেবদারুর পেছনে মাথা নুইয়ে মাটি থেকে দু'টি ঝুড়ি তুলল। তাদের একটিতে ছিল আপেল, অন্যটিতে — স্ট্র-বেরি। পেতিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে নিল।

তাসিয়া মাসি হাতদু'টি নাড়তে লাগল:

— যাও, তুমি এসব কী করছ, বোরিয়া...

— আমি দিচ্ছি না, দিচ্ছেন নিনা ইগোরেভনা, — বলে বোরিয়া কাকু। — তিনিও শিগগিরই আসছেন। লেকাকে ঝাড়া হয়ে গেলেই আসবেন।

পেতিয়া জিজ্ঞেস করতে চাইল, কী দিয়ে উনি হর্তাকর্তা মিনসেকে ঝাড়ছেন, কিন্তু এমন সময় বোরিয়া কাকু মাথার উপর তুলল তার সুন্দর গিটারটি এবং পরে ওটা রাখল খাটে ভালেরির কাছে।

— আর এটা আমার কাছ থেকে!

ভালেরি আনন্দে আত্মহারা, এমনকি ধন্যবাদ বলতেও ভুলে গেল।

আর তাসিয়া মাসি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মুখ ফিরিয়ে নিল। তারপর হেসে বলে:

— বোরিয়া, তোর যে নিজেরই কিছু নেই।

— কিন্তু তোমরা তো রয়েছে! — বলে বোরিয়া কাকু।

তার এই কথাটি পেতিয়ার খুব পছন্দ হল।

ভালেরি গিটারটি নিয়ে এক-একটি তার নাড়াচাড়া করতে লাগল।

— বোরিয়া কাকু, তুমি আমাকে গিটার বাজানো শিখিয়ে দেবে?

— নিশ্চয়ই!

তাসিয়া মাসি ততক্ষণে নিয়ে এল বড় একটি পুঁটলি, এবং তাতে ছিল ডোরা-কাটা জ্যাম্পার আর কম্পাস। কম্পাসটি একেবারে সত্যিকারের, যেমনটি থাকে নাবিকদের কাছে: ধাতুর তৈরি গোল কৌটো, আর উপরে কাচের ঢাকনী। আর কাচের নিচে একটি কাঁটা, তার এক প্রান্ত নীল, অপর প্রান্ত লাল। কাঁটাটি নড়ছে, যেন তা জ্যান্ত...

পেতিয়া কখনও এমন জিনিস দেখে নি! কম্পাসের সাহায্যে নির্ণয় করা যায় কোথায় উত্তর আর কোথায় দক্ষিণ, এবং কোনদিকে জাহাজকে যেতে হবে, — তাই বলল ভালেরি। সে আরও বলল:

— জানো বোরিয়া কাকু, এই পেতিয়াকেও আমাদের জাহাজে নিচ্ছি।

— বেশ, ভাল কথা, — উত্তরে বলে বোরিয়া কাকু। — এ রকম মানুষ সমুদ্রে প্রয়োজন।

সে ঠিক তাই বলেছে: 'প্রয়োজন'। পেতিয়া খুব খুশি। কিন্তু একটি কথা, সে তো ভালেরিকে

কোন উপহার দিল না। কাগজের মানুষগুলির কথা তার মনে পড়ল, কিন্তু হর্তাকর্তা মিনসের জন্য তার কষ্ট হল। তাছাড়া ভালেরির যদি তা পছন্দ না হয়।

— কাগজের মানুষ তোর ভাল লাগে? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— খুব, — উত্তর দেয় ভালেরি এবং হেসে ফেলে। — আচ্ছা, ওগুলো কী রকম রে?

— যদি চাস তো আমি তোকে উপহার দিতে পারি?

— তুই যে আমায় উপহার দিয়েছিস। তাসিয়া, আমাদের কাকটি কোথায়? বোরিয়া কাকু, পেতিয়া সকালে আমাকে একটি মজার কাক উপহার দিয়েছে। সত্যিই তো কাক দিয়েছিল!

তাসিয়া ওটাকে হাতে করে নিয়ে এল। পাখিটি ঘুমাচ্ছে। চোখ বুজে ঘুমাচ্ছে।

পরে যখন তার মাথায় আলো এসে পড়ল সে চোখ কোঁচকাতে লাগল। প্রথমে একটি চোখ সামান্য খুলল, পরে অন্যটি, আর তারপর ভয় পেয়ে তাকাল বড় বড় চোখে, এবং হঠাৎ ডানা ঝাপটা মেরে দিল উড়া!

তাসিয়া মাসি ছুটল কাকের পেছন পেছন। পেতিয়াও। কিন্তু কাকটি ঘাসের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে বেশ দূরে চলে গেল, তারপর সামান্য উড়ল, এবং আবার ছুটল অন্ধকার ও ভেজা ঘাসের মধ্য দিয়ে।

— পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো! — চেঁচিয়ে উঠল পেতিয়া।

কিন্তু পাখির ছানাটি ততক্ষণে ছোট্ট এক গাছের ডালে উঠে গেছে।

ব্যস, আর কোথায় পাত্তা মেলে!

বালিশের উপর হাতে ভর দিয়ে বসে আছে ভালেরি।

— ও কিছু না, — বলে তাসিয়া মাসি।

— বেড়াল যে ওকে খেয়ে ফেলবে, — আস্তে আস্তে বলে ভালেরি।

— এখানে কোন বেড়ালই নেই, — সান্ত্বনা দেয় তাসিয়া।

— কিন্তু ও যে উড়তে পারে না, — বলে ভালেরি।

— অন্য কাকেরা ওকে নিয়ে যাবে। তুই তো জানিস, পাখিরা তাদের বাচ্চাদের উড়তে শেখায়। — ভালেরিকে বোঝায় তাসিয়া, যেন ও কাঁদছে। কিন্তু ও কাঁদছে না। সে এখন বড় হয়ে গেছে। পাখির ছানাটির জন্য তার ভীষণ কষ্ট হল।

পেতিয়া উঠে গেল ঝোপঝাড়ের দিকে।

রাস্তা ভেজা, চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার এবং কোন সাড়াশব্দ নেই। পেতিয়া একটি ঝোপে হাতড়াল, তারপর আরও একটি, তারপর অন্যটি। ওখানে আরও বেশি অন্ধকার। পাওয়া যাচ্ছে মাটির গন্ধ, গাছপালার শিকড় আর বৃহদাকার কাণ্ডের গন্ধ।

পেতিয়া অপেক্ষা করে আছে। সে ভাবল, সকালের মত পাতা তুলতেই হয়তো দেখবে যে পাখির ছানাটি গোল চোখগুলি বড় বড় করে বসে আছে! কিন্তু পাখির ছানাটি নেই। খুঁজতে খুঁজতে পেতিয়া পড়ে থাকা বেড়া অবধি পেঁছে গেছে। সে আরও এগিয়ে যেত, কারণ ভালেরি মুখ কালো করে বসে ছিল। কিন্তু এমন সময় তাসিয়া মাসি তাকে ডাকল।

পেতিয়া ফিরে তাকাল — আর ওখানে খাটের কাছে টেবিলে জ্বলছে কেকের মধ্যে গাড়া মোমবাতি! মনে হল যেন ও-সবকিছু অনেক দূরে, অনেক অতীতের ব্যাপার!

পেতিয়া এক দৌড়ে ফিরে গেল। তারপর তারা চা খেল, আর বোরিয়া কাকু নিজের জন্য বোতল থেকে ঢালল একটু মদ। পেতিয়া খাটের উপর বসে আছে, তাসিয়া মাসি ভালেরির নতুন জ্যাম্পার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে তার পাগুলি।

সবাই বলছে, পেতিয়া ভাল ছেলে এবং প্রকৃত বন্ধু, আর পেতিয়া শুধু সবার দিকে তাকিয়ে আছে। এখন আর কোনকিছু না বললেও চলবে: এমনিতেই সবাই তাকে ভালবাসে। যেমন মায়ের কাছে — কোনকিছু না বলে চুপচাপই বসে থাকা যায়...

হঠাৎ কেন যেন বাতিটি ছোট হয়ে গেল, পাইনগাছও, আর কেক সহ টেবিলটি সরে গেল এক পাশে। কেউ যেন — হয়তো মা — পেতিয়াকে তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে।

পেতিয়া ঘুমের মধ্যে টের পেল কীভাবে তাকে বিছানায় রাখা হল আর বোরিয়া কাকু কীভাবে তার শার্টটি খুলল, এবং নিনা ইগোরেভনা জোরে ফিসফিস করে বলছেন:

— তুই অমনভাবে ওর শার্টটি টানছিস কেন? হাতগুলি মচকে দিস না! তুই না হয় এখানে হরির খুড়ো, কিন্তু আমাকে যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওর মা'র কাছে।

তখন পেতিয়া বলল:

— পেঁচা... আমার পেঁচা দাও!

তার কারণ সে তার পোষা পেঁচাটি ছাড়া কখনও ঘুমায় না। কিন্তু কেউ তা জানত না।

মা
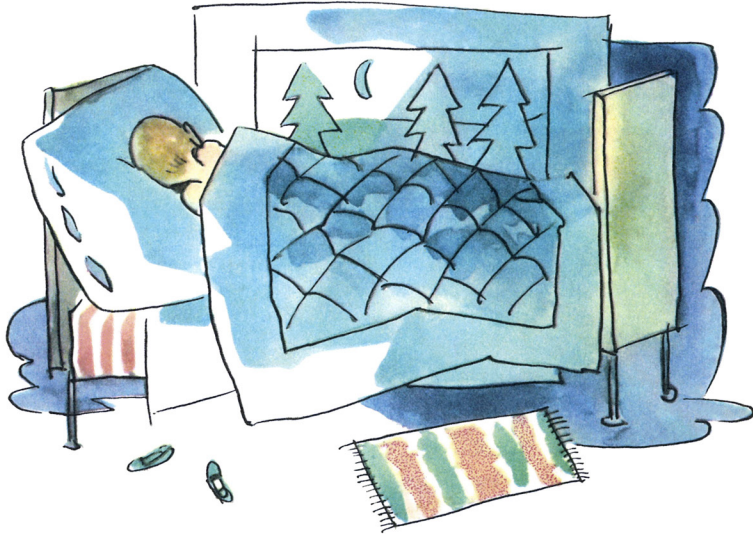
পেতিয়ার ঘুম ভাঙ্গল জলের ঠাণ্ডা ফোঁটা গায়ে এসে পড়াতে। তার খাটের কাছে জানলা খুলে নিনা ইগোরেভনা গামছা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন। আর মাছিরা ফিরে ফিরে ঘরে এসে ঢুকছে। বৃষ্টিতে কে-ই বা ঘর থেকে বেরতে চায়!

পেতিয়া হেসে উঠল।

— কী রে, গুরুজনদের নিয়ে হাসাহাসি করতে কে শিখিয়েছে তোকে?! — রাগ করেন নিনা ইগোরেভনা।

— ওরা কি গুরুজন? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— কারা?

— মাছিরা!

— দূর ছাই! — নিনা ইগোরেভনা আরও বেশি রেগে যান। — লোকে ঠিকই বলে, শান্ত ডহরে শয়তানের আড্ডা...

পেতিয়া ডহরের কথা আগেও শুনেছে: ওখানে নাকি শয়তানেরা থাকে। তবে সে জানে না, ডহর জিনিসটি কী। কিন্তু সে কোনকিছু জিজ্ঞেস করল না, কাপড় পরতে লাগল। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল, কারণ এমনিতেই ঠাণ্ডা আসছে খোলা জানলা দিয়ে, তার উপর নিনা ইগোরেভনা আবার গামছা দিয়ে বাতাস তৈরি করছেন।

অন্য যে ঘরটিতে ডাইনিং টেবিল রয়েছে ওখানে ইলেকট্রিক উনুনের জন্য বেশ গরম বোধ হচ্ছে। পেতিয়া অপেক্ষা করছে, কখন আলু আর কাটলেট গরম হবে। তার মনে আছে, গত রাত্রে

কে তাকে হাতে করে তুলে নিয়ে গেছে অন্ধকার ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে, আর তখন নীল আকাশে হাসছিল হলদে রঙের আধখানা চাঁদ। তবে পেতিয়া কেন যেন ভেবেছিল মা তাকে নিয়ে যাচ্ছেন। যদিও সে এখন বড় ছেলে, তবুও মা প্রায়ই তাকে হাতে করে নেন।

— নিনা ইগোরেভনা! — ডাকল পেতিয়া। — নিনা ইগোরেভনা, পাখিরা উড়তে পারে, কিন্তু মানুষ কেন উড়তে পারে না?

— তোর কী হয়েছে, বল তো? তুই কি কোন বৈজ্ঞানিক রচনা লিখছিস?

— না, আমি কিছুই লিখছি না। আমি কাটলেট খেতে চাই, — বলে পেতিয়া এবং উঠে দেখতে লাগল কীভাবে বৃষ্টি পড়ছে।

— ভয়ানক ছেলে রে বাবা, — দীর্ঘশ্বাস ফেলেন নিনা ইগোরেভনা। — ওর মনমতি বোঝাই দায়। একেবারে যেন বন্ধ একখানা বই।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। নিনা ইগোরেভনা মাথা বর্ষাতি দিয়ে ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়শিদের কাছে চলে গেলেন। পেতিয়াও ওভারকোট দিয়ে মাথা ঢেকে ছুটতে লাগল বাগানের মধ্য দিয়ে, তারপর পোড়ো জমি হয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে পায়ে-চলা পথ ধরে। পোষা পেঁচাটিকে ধরে রাখল শার্টের তলায়।

অবশ্য এটা ঠিক যে জ্যান্ত কাক — এক জিনিস, আর কাঠের পেঁচা — আলাদা জিনিস, তা যতই পোষা হোক না কেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওটাকে সঙ্গে নিল, কেননা তার মনে আছে ভালেরি কীভাবে মুখ কালো করে চেয়ে ছিল ঝোপঝাড়ের দিকে।

ঘরে ভালেরি ছিল একা। পেতিয়াকে দেখে সে খুব খুশি হল। তার আনন্দে পেতিয়াও আনন্দিত।

পরে এল তাসিয়া মাসি। পেতিয়াকে দেখে সেও আনন্দিত। তখন পেতিয়া তাকে জিজ্ঞেস করল — পাখিরা উড়তে পারে, কিন্তু মানুষ কেন উড়তে পারে না।

— পাখির পাখা আছে, আর মানুষের নেই, — উত্তর দেয় তাসিয়া। — বুঝলি? মানুষের পাখা থাকলে মানুষও উড়তে পারত।

— আচ্ছা, তাসিয়া মাসি, মা কবে আসবেন, জান?

তাসিয়া পেতিয়ার গলা ধরে তাকে চেপে ধরল নিজের সুন্দর পোশাকের সঙ্গে।

— আমি নিজেই তোর মা'র অপেক্ষা করে করে হয়রান! মা'র জন্য খারাপ লাগছে বুঝি?

— জানি না, — বলে পেতিয়া।

সে তখন লক্ষ্য করল যে ভালেরি তাসিয়ার দিকে তাকাল, মাথা নাড়াল, তাসিয়া যেন ওকে কোনকিছু বলল, আর ও রাজী হল। তারা দু'জনই পেতিয়ার চেয়ে বড়, কিন্তু তারা তাকে নিয়ে হাসাহাসি করল না। আগে একটু হাসত বৈকি, তবে এখন আর হাসে না।

পেঁচার সকাল এবং নীল পরকলার দিন

তাসিয়া চলে গেলে ভালেরি পেঁচাটিকে দেখতে পেল।

— আরে, কী বড় বড় চোখ! — বলে ভালেরি। — তুই লুকিয়ে থাক্, আর ও তোকে খুঁজে বের করুক।

পেতিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হল। তখন ভালেরি ভয়ানক এক স্বরে বলতে লাগল:

— এখন দিন, পেঁচা কোটরে ঘুমাচ্ছে। কিন্তু যেই সন্ধ্যা হবে, অমনি ও চোখ খুলবে... লুকিয়ে পড়!

পেতিয়া তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল।

প্রথমে সে লুকাল কাচের বাক্সের পেছনে, দ্বিতীয় বার — টেবিলের তলায়, তারপর — আলমারির পেছনে এবং ওখানে বসে থাকল চুপচাপ। কেবল শ্বাস ফেলছিল জোরে জোরে। পেঁচা যেভাবে বলছিল তাতে তার ভয় হল: 'চোখ আমার দেখছে, কান আমার শুনছে! শিকার এবার ছাড়ব না!' আর তারপর চেঁচিয়ে উঠছিল: 'আলমারির পেছনে, আলমারির পেছনে!' প্রতিবারই খুঁজে বের করতে পারল, তবে সঙ্গে সঙ্গে নয়।

— তোর, মানে পেঁচার, ওই 'শিকার এবার ছাড়ব না!' কথাটি কিন্তু বেশ শোনায়! — খেলা শেষ হলে বলে পেতিয়া।

— ওটা কবিতার মত, — বলে ভালেরি। — তুই তো নিজেই কবিতা জানিস?

— জানি। অনেকগুলোই জানি:

> ভানিয়া ভানিয়া ছেলেটি সে বোকা,
> লেজ-ছাড়া ঘোড়া কিনে খেয়েছে দারুণ ঠকা!..

তবে কবিতাটি পেঁচাকে নিয়ে নয়।

— পে'চাকে নিয়েও সম্ভব, — বলে ভালেরি। — রাত্রিবেলা পে'চা বসে আছে ডালে। চারিদিকে বন। অন্ধকার আকাশ, আর তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে কালো কালো ফারগাছগুলি। উপরে যেখানে পে'চা বসে আছে সেখানে ঠাণ্ডা, আর নিচে অর্থাৎ গাছের তলায় — গরম। ওখানে কী যেন ছুটাছুটি করছে।

— কী? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— পে'চাও ঠিক তাই ভাবছে: কী? এবং জিজ্ঞেস করে: 'কেন তুই ঘুমোচ্ছিস না? কী নাম তোর?'

— ই'দুর, — জবাব দেয় পেতিয়া।

আর ভালেরি আবার পে'চা সেজে বলে:

— আমার ঘরে বেড়াতে আসিস।

আর পেতিয়া:

— আমি চাই না!

আর ভালেরি:

— 'তাহলে নিজেই আমি আসব! শিকারটি এবার ধরব!' বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ই'দুরটির দিকে।

— আর ই'দুর গর্তে, আর ই'দুর গর্তে ঢুকে পড়ল! — তাড়াতাড়ি চে'চিয়ে উঠে পেতিয়া।

— পে'চা বসে পড়ল ডালে, — বলে ভালেরি, — এবং গোঙাতে থাকে:

ই'দুর আমার চাই না,
রাতে আমি খাই না!

পেতিয়া খুব খুশি যে সবকিছু ভালয় ভালয় কেটে গেছে।

তাসিয়া মাসি এল। প্লেটে করে আনল দু'টি গ্লাস। তার অন্য হাতে নীল এক পরকলা। ওটা সে ছুঁড়ে ফেলল ভালেরির কাছে কম্বলের উপর:

— চেয়ে দেখ তো!

ভালেরি পরকলাটি চোখের কাছে নিয়ে তাকিয়ে দেখে বলল:

— নীল তাসিয়া।

পেতিয়াও দেখল ও বলল:

— নীল দই!

— এটা দই নয়, — বলে তাসিয়া। — তোদের জন্য দুধ গরম করে এনেছি।

— নীল দুধ! — চেঁচায় পেতিয়া।

— নীল গ্লাস! — চেঁচায় ভালেরি।

তারপর জানলা দিয়ে তাকিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল:

— আরে, নীল গাছপালা!

— ঠিক আছে, এবার দুধটা খেয়ে নে, — বলে তাসিয়া। — তোদের খিদে আমার জানা আছে, তাই দুধ একটু বেশিই এনেছি!

— নীল খিদে! — চেঁচায় ভালেরি।

তাসিয়া মাসি হেসে ফেলে:

— হয়েছে, বাজে বকুনি রাখ তো!

ভালেরি ও পেতিয়া একসঙ্গে চেঁচাল:

— নীল বাজে বকুনি!

এইভাবে অনেকখন তারা বলাবলি করে — হয়তো, পুরো একটি ঘণ্টা!

তাসিয়াও তাদের সঙ্গে হাসে।

কম্পাসের দিন

একদিন সন্ধ্যায় ভালেরি বলল:

— শোন পেতিয়া, আমাদের হরেক রকমের দিন ছিল: জন্মদিন, নীল পরকলার দিন...

— পেঁচারও দিন ছিল, — যোগ করে পেতিয়া। — আমাদের যে কাঠের পেঁচা রয়েছে।

— হ্যাঁ, ঠিক। আর কাল হবে কম্পাসের দিন। রাত্তিরে ভাল করে ঘুমিয়ে নিয়ে কাল একটু সকাল সকাল চলে আসবি। আমরা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে বেরব...

পেতিয়া কেবল ভাবে: কম্পাসের দিন — সে আবার কেমন হবে?

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ছুটে গেল টিলার বাড়িটিতে। আর ওখানে সবকিছু আগের মত নয়: পাইনের নিচে খাটটি নেই, অথচ আকাশে সূর্য রয়েছে। জানলাগুলি বন্ধ, তবে দরজাটি খোলা। পেতিয়া এই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে। বার-বারান্দায় কেউ নেই, আর ভালেরির কামরা থেকে হঠাৎ শোনা গেল অপরিচিত জেদী এক গলা:

— মা, মা!

— আসছি!.. — রান্নাঘর থেকে সাড়া দেয় তাসিয়া, তার আওয়াজে আগের হাসিখুশি

ভাবটি নেই। সে ছুটে গেল, যাওয়ার পথে পেতিয়াকে ধাক্কা দিল এবং এমনকি লক্ষ্যও করল না।

পেতিয়া কিছুক্ষণ বার-বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ফিরে এল। ভালেরি যদি পরে রাগ করে? ও নিজেই তো সকাল-সকাল আসতে বলেছিল।

পেতিয়া আবার বার-বারান্দায় ঢুকল এবং দরজায় ঠোকা দিল:

— আসতে পারি?

— কে? — জিজ্ঞেস করল ওই জেদী গলাটি। — কে? ভেতরে এস।

পেতিয়া ঢুকল।

সোফায় শুয়ে আছে ভালেরি। পেতিয়াকে দেখে সে নড়ল না এবং প্রায় হাসল না। মনে হল ও যেন ভালেরি নয়।

— কী রে পেতিয়া?

— আমি এসেছি, — বলে পেতিয়া।

এই সময় ঘরে ঢুকল তাসিয়া। টেবিলে জাউয়ের প্লেটটি রেখে সে পেতিয়াকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে ঘর থেকে ওকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে:

— যা, পেতিয়া, বাড়ি যা। ভালেরির শরীর আজ ভাল নয়।

— আজ আমাদের কম্পাসের দিন, — বলে পেতিয়া।

— নে, কম্পাসটি নিয়ে যা, — বুঝল না তাসিয়া। — খেল গে।

— দাঁড়াও, তাসিয়া, — আস্তে আস্তে বলে ভালেরি। — আমি ওকে শুধু দেখিয়ে দেব...

— না, ভালেরি, তুই যে অসুস্থ।

— আমি কথা দিয়েছি।

তাসিয়া পেতিয়াকে সোফার কাছে নিয়ে গেল।

— দেখ, — আগের মতই আস্তে আস্তে বলল ভালেরি। — কাঁটার নীল অংশটি — দেখছিস তো — দেখায় উত্তর দিক। সব সময় উত্তর দিক। আর রাত্রে কাঁটাটি চকচক করে।

তারপর প্রায় কানে কানে যোগ করল:

— আর অন্য অংশটি দেখায় দক্ষিণ দিক...

এই সময় তাসিয়া পেতিয়াকে আবার জড়িয়ে ধরল ও ঘরের বাইরে নিয়ে গেল।

পেতিয়া বাগানে গিয়ে নিনা ইগোরেভনার কাছে বসে খেলতে লাগল।

ঘর থেকে ঝুড়ি হাতে এল হর্তাকর্তা মিনসে। সে স্ট্র-বেরি তুলতে লাগল।

— নে খা, — পেতিয়ার দিকে একটি বড় বেরি বাড়িয়ে দিল সে এবং তাকাল নিনা ইগোরেভনার দিকে।

কিন্তু পেতিয়া নিল না। বেরি খেতে ওর মোটেই ইচ্ছে নেই।

— ওকে আর জ্বালিও না। — চেঁচিয়ে উঠেন নিনা ইগোরেভনা। — ওকে মনোনিবেশ করতে দাও। দেখছ না, ও খেলছে!

পেতিয়া কম্পাসটি দেখছে। কম্পাসটি যেদিকেই ঘোরায় না কেন, নীল প্রান্তটি কেবল টিলার বাড়িটির দিকেই দেখায়। স্রেফ উত্তর দিকই নয়, টিলার বাড়িটিও।

পেতিয়া ছুটে গিয়ে ভালেরিকে ব্যাপারটি বলতে চাইল। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়।

রাত্রে
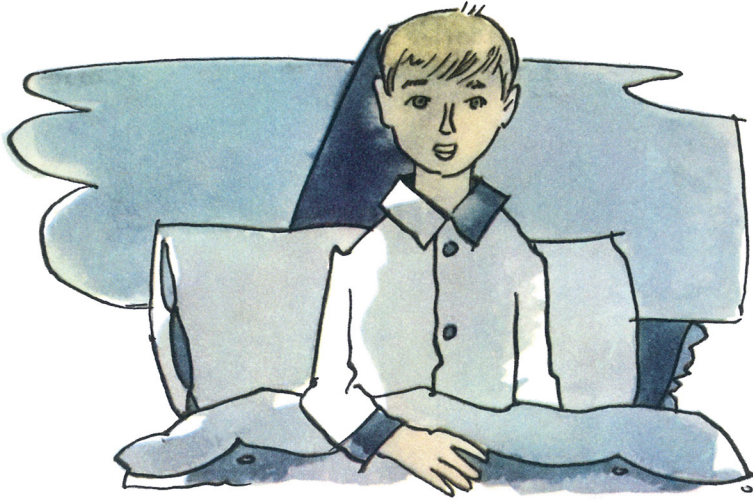
রাত্রে পেতিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল নারীকণ্ঠের কান্না শুনে।

নিনা ইগোরেভনা কাঁদতে পারেন না।

আর হর্তাকর্তা মিনসের পক্ষেও নারীকণ্ঠে কান্না সম্ভব নয়।

পেতিয়া মাথাটি একটু তুলল যাতে বালিশ তার ডান কানটিকে বাধা না দেয়। তখন শুনতে পেল:

— তোমরা বে-আক্কেল। একেবারে বে-আক্কেল! — খুব জোর গলায় বলছেন নিনা ইগোরেভনা।

আর বে-আক্কেল মেয়েলোকটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে:

— আমাদের আর কী-ই বা করার ছিল?

— হুঁ, কী করার ছিল! — সারা বাড়িতে শোনা যায় নিনা ইগোরেভনার গলা। — বাড়িটি কাউকে দিয়ে দক্ষিণে যাওয়া উচিত ছিল।

— ও যে যেতে চায় নি, — ফের ফুঁপাল মেয়েলোকটি।

— তাই তো আমি বলছি, তোমরা আগের মতই বে-আক্কেল রয়ে গেছ। বাচ্চা ছেলের কথা কে শুনে, বলো তো?!

— আমি চললাম, — বলল মেয়েলোকটি।

পেতিয়ার মনে হল কণ্ঠটি তার পরিচিত।

— কত রুবলের ঘাটতি? — জিজ্ঞেস করেন নিনা ইগোরেভনা।

— দু'শো রুবল, — উত্তর দেয় মেয়েলোকটি। — চলি তাহলে...

কিন্তু নিনা ইগোরেভনা রাগের সঙ্গে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন:

— ঠিক আছে, আমি দু'শো রুবল দিচ্ছি তোমায়। তবে বোরিয়াকে কিন্তু একটি পয়সাও না।

— আরে কী যে বলেন, ও নিজেই নেবে না।

— হুঃ, নেবে না... — বলেন নিনা ইগোরেভনা। — ও তাহলে টাকা-পয়সা পায় কোথায়? ওই ড্রামা-ক্লাবে দু'এক পয়সাই তো পায়।

— আমি জানি না, — উত্তর দেয় মেয়েলোকটি।

— এখানে আর জানার কী আছে, — বাধা দিয়ে বলেন নিনা ইগোরেভনা। — এমনিতেই সবকিছুই পরিষ্কার, ও যে ইয়ার-দোস্তদের দয়াতেই বেঁচে আছে। তুমি কিন্তু ওকে বেশি লাই দিও না!

পেতিয়ার মনে পড়ল, কীভাবে বোরিয়া কাকু তাকে নিয়ে হামেশা বেড়াতে যায় ও তার সঙ্গে খেলাধুলা করে। ও খুব ভাল লোক। বোরিয়া কাকুর জন্য তার কষ্ট হল: কেন নিনা ইগোরেভনা তার সম্পর্কে এরকম বলছেন, যেন সব দোষই তার? তা ঠিক নয়।

পেতিয়া যখন এসব ভাবছে, তখন মেয়েলোকটি ধীরে ধীরে বার-বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল।

পেতিয়া কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল — দেখবে কে ওই মেয়েলোকটি। জানলার পাশ দিয়ে গেল ভালেরির মা। এমনকি অন্ধকারেও তাকে চিনে ফেলল পেতিয়া। ভালেরির মা হামেশা ফিটফাট হাসিখুশি। অথচ এখন কাঁদছে।

পেতিয়া শুয়ে শুয়ে কেবল ভাবতে থাকল। অনেকখন তার চোখে ঘুম এল না।
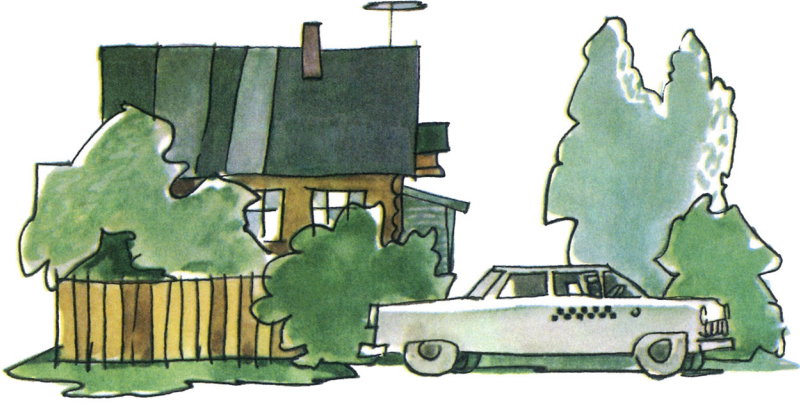
আমার কাপ্তেন

পেতিয়ার ঘুম ভাঙ্গল দেরিতে। এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে, দেরি হয়ে গেছে: বার্চগাছের একেবারে মগডাল থেকে গরম সূর্যের কিরণ এসে পড়ছে তার চোখে। নড়ছে বার্চ, গায়ে এসে লাগছে গরম হাওয়া!

পেতিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় পরল: ভালেরির কাছে যেতে হবে। কিন্তু দরজা বন্ধ। তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। বেড়াল ছানার মত তাকে বন্ধ করে সবাই চলে গেছে। তখন পেতিয়া জানলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। লাফ দিতে গিয়ে মাথায় সামান্য লেগেছে। তারপর ছুটল বাগানের মধ্য দিয়ে। দিনটি ছিল খুব গরম।

ভালেরির বাড়ির কাছে ছোট্ট একখানা মোটর-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পেতিয়া আরও তাড়াতাড়ি ছুটল। তবে গাড়িটি হঠাৎ ছেড়ে দিল। পেতিয়া দেখতে পেল না, কে তার ভেতরে। কিন্তু সে জানত। হাত নাড়ল পেতিয়া। আবার ছুটল।

তখন গাড়িটি থামল। পেছনের সীটের কাছে কাচের জানলাটি নেমে গেল, এবং ভেতর থেকে তাকাল ভালেরি। সে কালকের মত অসুস্থ ছিল না, তবে মুখটি খুব ফ্যাকাশে, আর চোখের দৃষ্টি অন্যান্য দিনের মত নয়, অনেকটা গম্ভীর।

পেতিয়া দৌড়ে গেল। চাকার কাছে গিয়ে উল্টে পড়ে নি অল্পের জন্যে। জানলা খোলা দরজাটি ধরল সে।

— আস্তে আস্তে, পেতিয়া, — বলে তাসিয়া মাসি।

তাসিয়া বসে ছিল ড্রাইভারের কাছে, আর ভালেরির পাশে বসে ছিল বোরিয়া কাকু। সে ভালেরির পিঠে হাত দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে।

— হাত দে, — নিজের হাত বাড়িয়ে বলে ভালেরি। — আমি দক্ষিণে চলে যাচ্ছি।

সে কথা বলছে আস্তে আস্তে, তবে কালকের চেয়ে জোরে।

পেতিয়া পকেট থেকে কম্পাসটি বের করল।

— না, না, — বলে ভালেরি। — কম্পাসটি তোর কাছে রেখে দে। এখন আমার জায়গায় কাপ্তেন হবি তুই। আর আমি দক্ষিণে থাকব। ওখানে কাপ্তেন হব। — এবং হঠাৎ পেতিয়ার দিকে চেয়ে হেসে ফেলল। — আর পরে আমাদের জাহাজগুলি সমুদ্রে মিলবে।

পেতিয়ার হাত থেকে কম্পাসটি নিল ভালেরি।

— এই দেখ, কাঁটার লাল অংশটা কোন দিক দেখাচ্ছে? ওদিকে দক্ষিণ। ওদিকেই জাহাজ নিয়ে যাবি। নে কম্পাস।

— হয়েছে, আর সময় নেই, যাওয়া যাক, — তাড়া দেয় তাসিয়া মাসি।

— একটু দাঁড়াও, মা!

— না, ভালেরি, সময় নেই। ট্রেন চলে যাবে। আসি, পেতিয়া।

মোটর-গাড়িটি ছেড়ে দিল।

— তাহলে চলি, কাপ্তেন। — হাত নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল ভালেরি।

— সেরে উঠ্, কাপ্তেন! — পেতিয়াও চেঁচিয়ে বলল। সে হাত নাড়ল এবং গাড়ির পেছন পেছন কয়েক পা এগুল। কিন্তু গাড়িটি শিগগিরই মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পেতিয়া ফিরে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিল। গাড়িটির চাকার চাপে শুয়ে পড়েছে ঘাসগুলি। গেট খোলা। দাঁড়িয়ে আছে খালি বাড়িটি, ওখানে এখন আর কেউ নেই।

পেতিয়া দেউড়িতে বসে পড়ল এবং ওখানেই বসে থাকল অনেকখন... হঠাৎ ঘরের দরজাটি খুলে গেল। বেরলেন নিনা ইগোরেভনা।

— তোর কাছ থেকে লুকিয়ে থাকাও মুশকিল! — বলেন নিনা ইগোরেভনা।

— আমি জানতামই না যে আপনি এখানে লুকিয়ে আছেন, — জবাব দেয় পেতিয়া।

— আমি লুকোই নি, ওদের গোছগাছ করতে সাহায্য করছিলাম। — বলেন নিনা ইগোরেভনা। — হঠাৎ সবাই চলে গেল। সবকিছু একেবারে উলট-পালট করে দিয়ে গেছে।

— কী উলট-পালট করেছে? — জিজ্ঞেস করে পেতিয়া।

— বাড়ি। বুঝলি?

পেতিয়া বার-বারান্দায় ঢুকল। ভালেরির ঘরের দরজায় পড়ে আছে কাঠের পেঁচা। সে পেঁচাটিকে তুলে শার্টের তলায় লুকিয়ে ফেলল। নিনা ইগোরেভনা দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। তিনি রান্নাঘরে চলে গেলেন বাসনপত্র ধুয়ে রাখতে। এখন এই বাড়ির মালিক তিনিই এবং সবকিছুই তাঁর হয়ে গেল: অনেকগুলি ডেকচি, একখানা ঝাড়ু, হাতা, ন্যাকড়া!.. এটা আর ভালেরি কিংবা তাসিয়ার বাড়ি নয়। পেতিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে পোড়ো জমির দিকে গেল।

শার্টের তলায় পোষা পেঁচা, আর হাতে তার কম্পাস।

খালি বাড়িতে নিনা ইগোরেভনা কীভাবে ডেকচিগ্‌লি চে'চে পরিষ্কার করছেন তা আর স্মরণ করতে চাইল না পেতিয়া। সে কম্পাসটি দেখতে লাগল।

কাঁটার নীল প্রান্তটি আগেরই মত টিলার বাড়িটির দিকে দেখাচ্ছে। আর লাল প্রান্তটি — দক্ষিণে। দক্ষিণ দিকে।

ওই সেদিকে, যেদিকে চলে গেছে কাপ্তেন।
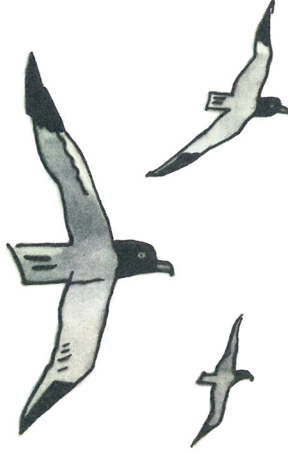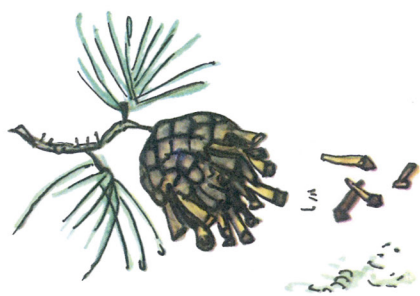
প্রকাশকের নিবেদন

আদরের কিশোর-কিশোরীরা!

বাংলা ভাষায় 'রামধনু' সিরিজে এবার আমরা প্রকাশ করলাম লেখিকা গালিনা দেমিকিনার 'বনের গান' নামক বইটি।

এই সিরিজে আগেই বেরিয়েছে:

'বৃষ্টি আর নক্ষত্র' — সোভিয়েত দেশের বিভিন্ন জাতির লেখকদের গল্প-সংকলন। এতে রয়েছে গুরুগম্ভীর ও হাসিখুশি উভয় ধরনেরই গল্প।

'স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা' — মহান ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন সম্পর্কে গল্পের বই। ফোটোগ্রাফে শোভিত।

'যাদু তীর' — প্রবীণা শিশু সাহিত্যিকা ল্যুবোভ ভরন্কোভার বই এটি। তাতে আছে মজার এক রূপকথা 'যাদু তীর' এবং পিতৃভূমির মহাযুদ্ধের সময় অনাথ হয়ে যাওয়া এক খুকির জীবন নিয়ে লেখা 'শহরের মেয়ে' নামক বড় একটি কাহিনী।

'ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক ঘটনা' — লিখেছেন আনাতোলি আলেক্সিন, মনকাড়া মজার বই, অ্যাডভেঞ্চারে ভরা।

'পৃথিবী দেখছি' — বিশ্বের প্রথম মহাকাশচর, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ইউরি গাগারিন তাঁর ঐতিহাসিক মহাকাশ যাত্রার কথা বলছেন। বহু প্রামাণিক ফোটোগ্রাফ আছে বইয়ে।

চিরায়ত রুশ সাহিত্যের দিকপালদের বই। তার মধ্যে ইভান তুর্গেনেভের **'মুমু'** আর আন্তন চেখভের **'কাশতানকা'** সহ অন্যান্য বহু বই রয়েছে।

এসব বই তোমাদের ও তোমাদের গুরুজনদের কেমন লাগল তা জানতে পেলে প্রকাশালয় খুব খুশি হবে।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবোভস্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

গালিনা দেমিকিনা
বনের গান